

অক্ষয়কুমার দত্ত

মডেল ভগিনী।

(উপন্যাস।)

প্রথম ভাগ

ও

দ্বিতীয় ভাগ।

দ্বিতীয় মুদ্রণ।

কলিকাতা ;

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেশিন প্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১২৯০ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ভাগের

মুখবন্ধ

এ গ্রন্থ উপন্যাস নহে, উপকথা নহে; তবে উপন্যাস নাম না দিলে, পাঠক বই পড়েন না; কাজেই মডেল-ভগিনী উপন্যাস বলিয়া অভিহিত হইল।

বঙ্গের পূর্ব্ব-ইতিহাস অনেকেই লিখিয়াছেন, কিন্তু নব্য-বঙ্গের ইতিহাস কেহই বড় একটা লেখেন নাই। নব্যবাঙ্গালীর জীবনচরিতও এ পর্য্যন্ত কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। মডেল-ভগিনী গ্রন্থে নব্য-বঙ্গের ইতিহাস, এবং নব্য-বাঙ্গালীর জীবনচরিত—একাধারে দুই পদার্থ দেখিতে পাইবেন।

মডেল-ভগিনীতে অষ্টবজ্র আছে। চন্দ্রের সুবিমল সুধা, অগ্নির জ্বলন্ত উত্তাপ, সূর্য্যের প্রখর কিরণ, বসন্তের মলয় সমীরণ, হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গ, মাধবীলতার প্রিয়তম ভৃঙ্গ, ইন্দ্রের শ্রীমতী শচী, নরেন্দ্রের মিসেস্ পাঁচী—এ সমস্তই আছে।

স্ত্রী-পুরুষ, যুবক যুবতী, বালক বালিকা—মডেল-ভগিনী পাঠে পরম জ্ঞান লাভ করুন, দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হউন, সংসারে সাবধান হউন—ইহাই গ্রন্থকারের প্রার্থনা।

কলিকাতা }
৪ঠা শ্রাবণ ১২৯২। } শ্রী—

দ্বিতীয় ভাগের

মুখবন্ধ।

বাঙ্গালা দেশে আজও মহা-উপন্যাস লিখিবার রীতি প্রচলিত হয় নাই। আমাকেই সে পথ দেখাইতে হইল। ইংলণ্ড হইতে এ প্রথা,—এ নূতন ঢঙ আমদানি করা হইল।

উপন্যাস তিন ভাগে বিভক্ত না হইলে, ইংলণ্ডীয় নর-নারী-সমাজে, তাহা প্রকৃত উপন্যাস বলিয়া গণ্য হয় না। আজ কাল ইহাই ফ্যাশন। ইংরেজের পুচ্ছধারী বাঙ্গালী নর-নারীর নিমিত্ত মডেল ভগিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হইল। সত্ব, রজ, তম—ত্রিগুণাত্মক না হইলে আদর্শ-গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় না।

মডেল ভগিনী প্রথম ভাগ স্বর্গে উঠিবার পাঁকা সিঁড়ি, দ্বিতীয় ভাগে কেবল স্বর্গভোগ, তৃতীয় বা শেষভাগে মোক্ষফল লাভ।

কলিকাতা
১২ই আশ্বিন ১২৯৩ } শ্রী——

মডেল ভগিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জ্যৈষ্ঠ মাস। দিবা দ্বিপ্রহর। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, বাতাস সাঁ সাঁ করিতেছে, মন খাঁ খাঁ করিতেছে। স্থলে, বাবুর বাগানে, দাড়িম্ব পত্র যেন ঝলসিয়া গিয়াছে; কদম্বকাণ্ড যেন নীরস, নির্গুণ, নিশ্চলভাবে, পরমব্রহ্মের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে। জলে কমল-সরোবরে, তপন-সোহাগে তৃপ্ত হইয়া; কমলিনীকুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। এদিকে নভোমণ্ডলে পাখী, প্রাণবঁধু জীবনধন জলকে "ফটী-ঈক জল" বলিয়া ডাকিতেছে। ওদিকে, তারকেশ্বরের মোহান্তের হাতীটা অতিগরমে ক্ষেপিয়া উঠিয়া, জলে পড়িয়া কমলদলের অন্তরালে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। স্বভাবের এই বিপরীত ব্যবহারে বঙ্গভূমি চমকিত।

আরও কথা আছে। অতি-গরমে আম পাকিল, জাম পাকিল, লিচু পাকিল, কলা পাকিল,—চুল পাকিবে না কেন? হাতী ক্ষেপিল, কমলিনী ফুটিল, দাড়িম ঝলসিল,—বাবি-পতন হইবে না কেন? ঘর গরম হইল, ভাই-ভগিনীর দেহ গরম হইল, ঘাম বাহিরিল, কাপড় ভিজিবে না কেন?

কলিকাতার দালানগুলা যেন দাবানল জ্বলিতেছে। খোলার ঘর ত আগুনের খাপরা। টীনের ছাদ তাতিয়া তাঁহা তাঁহা করিতেছে। নূতন চুণকাম-করা সাদা দেওয়ালে মধ্যাহ্নতপনের তাপ লাগিয়া, গরিব পথিকের চক্ষু কেবল ঝলসিতেছে। যে বাড়ীগুলার হলদে রঙ, সে গুলাতে বরং একটু রক্ষা আছে। চক্কা-চাপা-অসূর্য্যম্পশ্যনব-দূর্ব্বাদলশ্যাম-রঙের অনুকরণে

যে সকল বাড়ীতে আজকাল একটু হরিতালী-গোছ রঙ্‌ মাখান হয়, সেইখানেই কতকটা উত্তপ্ত পথিকের মন-প্রাণ-শরীর ঠাণ্ডা হইতে পারে।

বড় সুখের বিষয়, কালকাতার বাড়ী যতই জরাজীর্ণ হইতেছে, ততই ঐ হরিতাল রঙে একটু "নিকন-পোঁছান" করিয়া, তাহার ভাড়া বাড়ান হইতেছে। বাড়ী পড়-পড়; বনিয়াদে ঘুন ধরিয়াছে; ছাদ ফাটিয়াছে, কড়ি ঝুলিয়াছে। ভাবিলাম, মিউনিসিপালিটী হইতে দুচার দিনের মধ্যে উহাকে ভাঙ্গিয়া দিবার আজ্ঞা আসিবে। ওমা! পনের দিন পরে দেখি, কতকগুলা রাজমিস্ত্রী, সেই হরিতালী রঙ, হাঁড়া হাঁড়া গুলিয়া হুহু শব্দে তাহার অষ্টপৃষ্ঠললাটে মাখাইতেছে। দেখিতে দেখিতে, দিব্য ফুট্‌ ফুটেটী হইল। তখন বাড়ীর কর্ত্তা, প্রচার করিতে লাগিলেন, "আমার ইচ্ছা, (ত্রিশটাকা ভাড়া ছিল), দশ টাকা বাড়াইয়া, চল্লিশ টাকা করি। গিন্নি বলেন, তা হবে না; পঞ্চাশ টাকার কম এবার ও-বাড়ী ছাড়া হবে না।" পঁয়তাল্লিশ-বর্ষ-বয়স্কা গৌরাঙ্গনা, গোলাপী রঙে ছোপান, পুরান কাপড়ের কাঁচুলি-কসনে, ডবলবিজিটের দাবী করে।

কলিকাতার কোন এক ফিরিঙ্গীপাড়ায় ঐরূপ একটা হল্‌দে বাড়ীতে, এ গরমের দিনে, কয়েকজন নরনারী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বাড়ীটা প্রকাণ্ড; দ্বিতল; সুমুখে বড় বড় থাম; যেন নবাবের খাসবৈঠকখানা। ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ও হরি।—নীচের ঘরগুলো অন্ধকার!—সপ্‌সপ্‌ জল উঠ্‌ছে!—একটা দুর্গন্ধঃ! বসবাস, কি দাঁড়াবার একটু যদি স্থান থাকে, তা আমার দিব্য আছে! তবে নরনারীগণের, নীচে তলার সঙ্গে বড় একটা অধিক কারবার নাই। সংসারধর্ম্মে থাকিতে হইলে, অনেক কষ্টই সহিতে হয়! সময়ে সময়ে মানব-ধর্ম্মের আবশ্যকীয় কোন কাজ পড়িলে, সেই অন্ধকারময় ঘরেই লোকজনের সহিত দেখাসাক্ষাৎ-আদি করিতে হয়। অভ্যাসবশত গৃহস্থের অন্ধকারে তত অসুবিধা হয় না। কিন্তু আগন্তুকের প্রাণবিয়োগ।

সাধারণ নিয়ম এইরূপ হইলেও বিশেষসুবিধা আছে। বিচালীওয়ালা,

টীকেওয়ালা, জুতাবুরুষওয়ালা, দরজী, রাজমিস্ত্রী, প্রভৃতি যত বাজেলোক আসে, তাহাদের সঙ্গেই কেবল নিম্নতলে কথাবার্তা, কার্-কারবার চলে। কোন ভদ্রলোক আসিলে, তাঁহাকে নীচে বসিতে, দাঁড়াইতে, বা কথা কহিতে কিছুই হয় না; একেবারে গট্‌গট্ উপরে চলিয়া যাও, নিষেধ নাই, অবারিত দ্বার। আরও বিশেষ-সুবিধা এই যে, পরিচিত বিশেষ-বন্ধুবান্ধব আসিলে, গৃহস্থ শীঘ্র স্বয়ং আসিয়া, সসম্ভ্রমে তাঁহাকে নীচে হইতে উপরে লইয়া যান। এক কথায়, নীচেতলাকে বর্জ্জিতদেশ, বা নরককুণ্ড বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

নিম্নদেশ নরক হউক, ধিক্কারজনক হউক, উপরিভাগ কিন্তু নন্দনকানন। একবার ঠেলে ঠুলে, চোখ বুজে, নাকে কাপড় দিয়ে, উপরে উঠিতে পারিলে প্রথমে মনে হয়, আঃ বাঁচিলাম, এ যে, দ্বিতীয় স্বর্গ! দ্বিতলের দ্বারে দ্বারবান সদা দণ্ডায়মান। পাগ্‌ড়ো, চাপকান, পায়জামা, দিল্লীর নাগ্‌রা সুকলি তাঁহাতে আছে। পরিচিত, অপরিচিত, সুপরিচিত যাঁহাকে তিনি দেখিতেছেন, তাঁহাকেই অমনি তিনি ঘাড় নোয়াইয়া সেলাম করিতেছেন। যেন কাঠের পুতুল, কলে কাজ করিতেছে। হাসি নাই, ফূর্ত্তি নাই, কথা নাই, অঙ্গচালনা নাই,—ঠায়, ঠিক্ সোজা গাছের গুঁড়ির মত সে ব্যক্তি দণ্ডায়মান।

দ্বারবানরূপ জীবনকে দেখিয়াই, এক প্রকাণ্ড হলে প্রবেশ করিতে হয়। সে হল প্রথম দর্শনমাত্র, আমাদের মত বাঙ্গালা-লেখকের মনে প্রথমে ভয় হয়,—জুতা খুলে ঢুকি, কি, জুতা পায়ে দিয়ে ঢুকি? জুতা পায়ে দিয়া ঢুকাই যদি নিয়ম হয়, তবে, জুতা খুলিয়া ঢুকিলে আমাকে অসভ্য বলিবে। আর নিয়ম যদি বিপরীত হয়, অথচ আমি জুতা পরিয়া ঢুকিলাম, তাহা হইলেও আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর কুলাঙ্গার বলিয়া পরিচিত হইব। প্রথম দর্শনেই এই বিপদ। জুত রাখি, কি জুতা খোল,—এই সংশয়দোলায় চিত্ত ঘুরিতে থাকে।

প্রথমতঃ মেজে মাহুরিত; তার উপর সতরঞ্চ; তস্য উপর,কার্পেট বিছান। অর্থাৎ যেন প্রথমতঃ ঘনদুধ, তার উপর দু আঙ্গুল পুরু সর, তার উপর বৌ-বাজারের ভীম বাবুর কাঁচাগোল্লা,—এই দেবোপম তিন মহাপ্রাণীর উপর কেমন করিয়া আমার সেই ছেঁড়াজুতা বিসর্জ্জন দেখি? জ্ঞানশূন্য কর্তব্য-

বিশিষ্ট, চারিদিকে চারুতালি সুশোভিত, নানাবিধ পার্থিব পদার্থপূর্ণ,—সেই দিনে-রেতে-ঘরে-বাহিরে একমেবাদ্বিতীয়ং নাস্তিং জিনিসং,—আমার সেই ছেঁড়াজুতাং—(আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোকে বলুন দেখি)—কেমন করিয়া সেই মাদুর-সতরঞ্চ-কারপেটরূপ টিনিটী-বক্ষে বিচরণ করিবে!

বুঝিলাম, সে ঘর ছেঁড়াজুতার উপযুক্ত ত' নহেই। তালতলার নূতন চটী তাহার সম্মান রাখিতে সক্ষম কি না, তদ্বিষয়েও সন্দেহ আছে। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের চটী, বিদ্যাসাগরের চটী, ডাক্তার সরকারের চটী, এই ত্রিচটীত' তাহার কাছে ঘেঁসিতেই পারে না। মিঃ লালমোহন ঘোষের বিলাতী বুট, রাম-শ্যাম-নবীন-জ্ঞানী বাবুগণের উৎসবের বার্ণিস বিনামা, সেই বিরাট, বিশাল বিস্তৃত ক্ষেত্রে বাহার দিবারই একমাত্র উপযুক্ত!

জুতা-বিভ্রাটের পরই, আসন-বিভ্রাট উপস্থিত। বসি কোথা? মেজেতে কার্পেটের উপর এমন একটু জায়গা নাই যে, খানিক পা ছড়ায়ে বসা যায়। "নস্থানং তিলধারণং!" কেবল রাশীকৃত চৌকিতে, ঘরটা বোঝাই করা। তাই কি ছাই, সব সোজা রকমের কেদারা?—স্থূল, সূক্ষ্ম, লঘু, গুরু,—ঢ্যাঙ্গা, গেঁড়া, চেপ্টা, চৌকা—নানা ঢঙের নানা রঙের যেন নানা সঙ উপস্থিত; কোন কেদেরাখানি এত মিহি যে, প্রাণখুলে ভরদিয়ে বসিতে ভয় হয়,—বুঝিবা এ দেহ-ভার অনুভব করিলে তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দে অন্তর্দ্ধান হইবে। আবার কোন কোন কেদেরা গোদাগাদা, মোটাসোটা যেন "বজর বাঁটুল,"—লোহার মুগুর মার, তবু ভাঙ্গিবে না,—স্বয়ং হিমালয় কবে দেখা করিতে আসিবেন বলিয়াই যেন সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। কোন কেদারায় বসিলেই, তিনি দুলিতে থাকেন;—নাগরদোলায় নায়ককে রস-পাকে দুলাইবার আয়োজন করিতেছেন। কোন চৌকী ল্যাজ-বিশিষ্ট,—চারিহাত লম্বা, বুক চিতাইয়া পড়িয়া আছেন,—তার উপর তুমি চৌদ্দপোয়া হইয়া শোও;—পা দুটা আকাশে উঠিবে, কোমরটা পাতালে পড়িবে, ঘাড়টা ত্রিশূন্যে বাঁকিয়া রহিবে, মাথাটা আঠেকাঠে বদ্ধ হইয়া সোনার গোখুরা সাপের ফুটন্ত চক্র গোছ সদাই ফণা ধরিয়া থাকিবে। কোন চৌকী, বিলাতীকলের গদী আঁটা,—বসিলেই অতল-স্পর্শ! চোরা-বালিতে প্রাণ হারাবো নাকি? কোন খানির নির্ম্মাণ-

কৌশল এইরূপ যে, দুজনে কেবল ঠিক্ সোজা, নড়ন-চড়ন-বিহীন হইয়া, মুখোমুখী বসিয়া থাক,—ঈষৎ অঙ্গচালনা করিলেই উভয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উভয়ের গায়ে ঠেকে। তখন ত্রাহি মধুসূদন! কল কথা, স্বচ্ছন্দে বসিবার একটুকুও স্থান নাই।

দাঁড়াইয়া থাকিইবা কেমন করিয়া? দেওয়ালের পানে চাহিলে চোখ ঝলসিয়া যায়। লাল, নীল, সবুজ, সাদা রঙের দেওয়াল-গিরি ঝল্ ঝল্ করিতেছে। মধ্যে মাঝে গ্লাসে ঢাকা ছবি। একখানি ছবি কাপড়ের ঘেরাটোপে ঢাকা। এইরূপ জনশ্রুতি, ঐ কাপড়ের আড়ালে আদম এবং ইব, আদিম এবং অকৃত্রিম অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন।

"অদ্বিতীয় স্বর্গে" আসিয়া যদি এরূপ ধাঁধা ঠেকে, এমন বিপদ-গ্রস্ত হইতে হয়, তবে তেমন স্বর্গে আমার কাজ কি? গা খুলে, পা মেলে, কাকাল চুলকাইতে চুলকাইতে, গুড়ুক তামাক না খেতে পেলে কি আমাদের পোষায়? ওরূপ আঁটাকাটাতে বদ্ধ থাকা কি ভদ্র লোকের কাজ? স্বর্গে দণ্ডবৎ! নরকেও দণ্ডবৎ! ভাল মানুষের ছেলের সোজাসুজি কারকারবারই ভাল। অতএব বিদায়!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বলি, ও হচ্চে কি? এই রকম ক'রে কি নভেল লেখে? সেই হল্‌দে ঘরের বর্ণনাটা, চলেছেত চলিইছে! ছি!

উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ, মেয়েমানুষ কৈ? সেই গুণবতী, জ্ঞানবতী, রসবতী, যুবতী প্রসন্নমতি নায়িকা কৈ? সেই হেসে হেসে ঢলে পড়া কৈ, সেই কেঁদে কেঁদে বুকভাসান কৈ, সেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চম্‌কে উঠা কই, সেই জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা কৈ? আচ্ছা, না হয়, নায়িকাই এখন নাই।

সেই জ্ঞানের সাগর, গুণের নাগর, রসের আকর নায়ক-প্রবরই কৈ? বসন্তকাল, আমের মুকুল, কোকিল, ভ্রমর, চাঁদ, পদ্ম, জ্যোৎস্না রাত্রি, গোধূলি, প্রভাত-তপন, দীর্ঘনিশ্বাস, হা হুতাশ, বুকের ভিতর কুলকাঠের অগ্নি, চোখের ভিতর মন্দাকিনী, মুখের ভিতর বক্তৃতা-রাগিণী, কণ্ঠের ভিতর বীণাপাণি, কত আর লিখিবে লেখনী,—উপন্যাসের এ সমস্ত প্রত্যঙ্গ কৈ? এ কালীয়দমনের যাত্রায় রাধাও নাই, কৃষ্ণও নাই; সুধু আখড়াই-গাওনায় কতক্ষণ আর আসর থাকিবে বল?

রাগ করিবেন না। হাতে সবই আছে। কিন্তু ধীরে, ধীরে, ধীরে। যখন যেখানে যে ভাবে যেটী চাহিবেন, তখনি সেইখানে তাহা পাইবেন। শিক্ষিতা, স্বাধীনতাপ্রাপ্তা, সাম্যভাবাক্রান্তা, অবিবাহিতা, যৌবন-বিকার-গ্রস্তা, বিরহিণী চান কি? দিব। পরিপূর্ণ-ভাণ্ডার। জগৎ-শেঠের কুঠি। কি রকম নায়ক দরকার? খাসা, শুকো, নিম-খাস, চলান, রাশী—এই পাঁচ প্রকার নায়কই উপস্থিত। উপনায়ক, উপ-নায়িকা, প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বরী, সখা, সখী আছে। আর ঐ পদ্মফুল, আমের মুকুল, কোকিল, ওসব ত' ধরিই না। আমের মুকুল ত' বাগানভরা; পদ্মফুল, ঠাকুরদাদার খাসদিঘীতে দিন রাতই ফুটে আছে;—কোকিল ত' গাছের পাখী, যাবে কোথা?

আছে সব। এখন এনে নিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করিতে পারিলেই হয়।

প্রথমে শাকান্ন; শেষে পায়সপিষ্টক। তাই প্রথমেই বসন্তবর্ণন এবং নায়িকার বিরহবর্ণন না করিয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম রোদের কথা পাড়িয়াছিলাম।

গ্রন্থারম্ভ। সেই জ্যৈষ্ঠমাসের রোদে, তাতিয়া পুড়িয়া, অনর্গল ঘাম ঝরাইতে ঝরাইতে, এক প্রবীণ ব্রাহ্মণ কলিকাতার রাস্তা দিয়া হাঁটিতেছে। বামুনের বয়স অনুমান ৩৭।৩৮ বৎসর; শ্যাম বর্ণ; মাথায় টীকি, পায়ে চটীজুতা; নাকে তিলক; স্কন্ধে মুড়িসেলাই চাদর, পরিধান থান ধুতি;—গায়ে পিরিহান নাই, মাথায় টেড়ি নাই, চড়নে গাড়ী নাই; ট্যাকে ঘড়ী নাই, হাতে ছড়ি নাই;—ব্রাহ্মণ তথাচ বেশ সতেজে রাজপথে চলিতেছে। সঙ্গে একটী মুটে,—মাথায় একটী সামান্য মোট করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে।

মুটে। হাম আউর কেতনা দুর যায়গা,—বড়বাজার বোলকে তোম হামকো লালাবাজারমে লে যাতা হ্যায়।

ব্রাহ্মণ। নারে বাপু, রাগ করোনা,—একটু এগিয়ে বাঁহাতি গলিতে ঢুকলেই বাড়ী।

মুটে। শিয়ালদকা ষ্টেসনসে হুঁয়াকা কেরেয়া আট পয়সা দস্তর হ্যায়—হাম পয়সা নেহি ছোড়েগা।

ব্রাহ্মণ। বাপু, ছ পয়সা চুক্তি করে, দু পয়সা বেশী বল কেন? তা পাবে না।

মুটে। তোমারা মোট লেও, পয়সা দেও, হাম আউর নেহি যাঙ্গে।

রক্ষা করুন। ক্ষান্ত হউন। আপনার আর উপন্যাস লিখে কাজ নাই। এ কি এ? কেবল ধাষ্টমো!—একটা বুড়ো ডোক্‌রা বামুন, আর একটা নগদা মুটে! এ নিয়েই কারবার! চলে যান্ আপনি।—সভ্য সমাজের আর অপমান করিবেন না।

মাপ করিবেন। প্রথমে শাকান্ন, শেষ পায়স পিষ্টক,—ইহাই আমি জানি। আগে যে আপনারা দই ক্ষীর সন্দেশ খাবেন, তা আমি বুঝি নাই। মজুত সবই আছে; ভাল,—তাহাই হইবে! তবে দুঃখ এই, এ পরিচ্ছেদ অঙ্কুরেই এই খানেই শেষ করিতে হইল। আর, ভাবনা এই, কেহ পাছে

মনে করেন যে, আমি নভেল লিখিতে অক্ষম। আমি বিলক্ষণ জানি, পরিচ্ছেদ যতই লম্বা হইবে, ততই লেখকের কৃতিত্ব অধিক। পদ্ধতি, প্রকরণ, ধারা, ধরণ—সবই অবগত আছি। ইংরেজী, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, গ্রীক কোটেশান দিতেও পারি; ভগবদ্গীতা, সাংখ্যদর্শন, ঋগ্বেদ মন্ত্র, উপযুক্ত স্থানে যোযনা করিতে শিখিয়াছি। অভাব কি? সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তী গাইয়ে, দাশরথী রায় ছড়া কাটিয়ে; ব্যালেণ্টাইন বারিষ্টার, পিকক বিচারক; সৈন্যাধ্যক্ষ নেপোলিয়ান, সুশিক্ষিত ফরাসী সৈন্য—সুতরাং দিগ্বিজয়ের অভাব কি?

তবে এইবার হাত দেখাই।

এখনও কথা ফুরায় নাই। বুড়োমানুষ কিছু বেশী বকে।

সপ্তমে সুর চড়াইয়া বাঁধিলাম। দীপক রাগে তান ধরিলাম। হয় লেখক, না হয় পাঠক, উভয়ের মধ্যে একজন ভস্মীভূত হইবেই হইবে। তবে সুবিধা এই, দীপকে পুড়িয়া মরিলে তানসেনের মত মহাক্ষেত্রে সমাধি হবে, তদুপরি রসজ্ঞ ব্যক্তিগণের বার্ষিক উৎসব হবে, এবং সঙ্গীত-আচার্য্যগণ সেই গোরের মাটী নিয়ে মাথায় দিবে! অতএব সুবিধা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই প্রকাণ্ড হরিতাল-রঙের হলে কি দেখিলাম? দেখিলাম, এক পীনোন্নত-পয়োধরা, আলুলায়িতকেশা, বিবিধবর্ণের বেশ-বিভূষিতা বরবর্ণিণী রমণী একাকিনী সেই ল্যাজবিশিষ্ট চেয়ারে অধিষ্ঠিতা। তিনি শায়িতা, কি উপবিষ্টা, কি দণ্ডায়মানা, হঠাৎ কিছুই বুঝিবার যো নাই। উত্তমাঙ্গ এবং পদদ্বয় ঈষৎ উর্দ্ধে উত্থিত, এবং নিতম্বপ্রদেশ নিম্নভাগে কথঞ্চিৎ অবনমিত! ফল কথা, শোয়া, বসা, এবং দাঁড়ানো,—এ তিনের সংমিশ্রণে যে ভাব দাঁড়ায়, ইহা তাহাই।

কমলিনীর কোমল অঙ্গ বুটিদার অঙরাখায় পরিবৃত। স-টান সতেজ অঙ্গরক্ষণী দেহযষ্টিকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া, ছাঁদিয়া রাখিয়াছে। মরি, মরি! বিধাতার কি এই কঠোর লীলা! এমন কুসুম-সুকুমার, মাখমে গড়া গোরাঙ্গখানি, কার অভিশাপে, কি দোষে, ঐ কালো-জামারূপ-কারাবাসে এ গরমের দিনে পচিতেছে? কমলাননা ইন্দুমুখের ঘামবিন্দু, রেশমী রুমাল সাহায্যে মুছিয়া ফেলিতেছেন;—না জানি, তাহাতে হাতের কত কষ্টই হইতেছে!

ও হরি! এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই;—পায়ে ষ্টকিন্! মাগী কে গো? এমন গুমট গ্রীষ্মে দিন দুপুরে যে মেয়ে-মানুষ, ষ্টকিন্ এঁটে ব'সে থাকতে পারে, তার কি অসাধ্য কিছু আছে?

বোধ করি, ওঁর কোন একটা বিলাতী ব্যারাম থাকিবে। এখনকার মা-লক্ষ্মীদের শরীরে একটা না একটা, রোগ লেগে আছেই। আহা! বড় ঘরের মেয়ে; লেখাপড়া শিখেছেন; কেতাবের সঙ্গে চোখের এক তিল বিচ্ছেদ নাই; কাজেই ওঁদের একটুতেই অসুখ করে। মা-লক্ষ্মীর দোষ কি? দোষ যত, তা আমার পোড়া কপালের!

হুহু শব্দে কপি-কলের সাহায্যে টানাপাখা চলিতেছে। দ্বারে, জানালায় জলময়ী খস্‌খসের পরদা! তবু কেন তিনি পায়ে ষ্টকিন্ এবং গায়ে জামা দিয়া ঘাম বাড়াইতেছেন?

বুঝি অতি লজ্জাশীলা হবেন! তাই কি? তবে ধনুকের ছিলার

মত সুতীক্ষ্ণটানবিশিষ্ট জামার রঙ্গভঙ্গ কেন? মাথায় কাপড়ও ত নাই। কেশকলাপ কেদারা ডিঙ্গাইয়া কার্পেট চুম্বন করিতে উদ্যত। সর্ব্বাঙ্গে ঘেরাটোপ; মাথাটী খোলা; এই বা কেমন লজ্জা? আর, এ নির্জনে লজ্জাই বা কাকে? বিধাতার বিচিত্র-লীলা বুঝিতে পারিলাম না।

কমলিনী ক্ষীণমৃদুপঞ্চমে বসন্তবাহার রাগিণীতে ডাকিলেন,—বেয়ারা, বরফপাণি লে আওনা! বেহারা আসিয়া মা-লক্ষ্মীর সম্মুখস্থ টেবিলে এক গ্লাস বরফজল রাখিয়া গেল।

রমণী কথা কহিলেন না, নড়িলেন না,—কেবল মিটিমিটি চাহিয়া রহিলেন।

অবাক্! ডেপুটী বাবুর বাড়ীতে ঝী নাই নাকি? পরপুরুষ অমন হন্‌হন্ ক'রে এ'সে সুমুখে দাঁড়ালো; তবু একটু মাথায় কাপড় দিলে না গা?—সেই ত্রিভঙ্গভাবেই খাড়া-শুয়ে রইল? মাগীকে ভূতে পায় নাই ত? জানি না, কোন্ গন্ধর্ব্বকন্যা, কোন্ নাগকন্যা অথবা কোন্ কিন্নরকন্যা, কলিকালে কলিকাতায় সমদ্ভূতা হইয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা ২টা বাজিল। গ্রীষ্মটা যেন পেকে উঠিল। কমলিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বারান্দার দিকে আসিয়া পা-চালি করিতে লাগিলেন। তাহাতে যেন মনস্থির হইল না। টেবিলের কাছে গিয়া এক চুমুক বরফজল খাইলেন; তাহাও যেন ভাল লাগিল না। টেবিলে শেলির কবিতাবলী ছিল; তাহা লইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই, মাঝখানটা খুলিয়া, মনে মনে পড়িতে লাগিলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই শেলির উপর বিরক্ত হইয়া, কেতাব রাখিয়া দিলেন। তার পর, আপন পকেট হইতে ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন, বেলা আড়াইটা বাজিয়াছে। মুখ বাঁকান এবং নাক শিট্‌কান দেখিয়া বোধ হয়, তিনি ঘড়ীর উপরও বিষম চটিয়াছেন। তখন একটা কেদারায় বসিলেন। বসিয়া, কাগজ, কলম লইয়া কি লিখিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে কমলিনীর মা, পাশের কুঠারি হইতে আসিয়া তথায় উপনীত হইলেন। জননী প্রবীণ ব্রাহ্মণী; গৌরাঙ্গী; হাতে কঙ্কণ; কপালে সিন্দুর, মাথায় কাপড়। মা বলিলেন, "বাছা, দুপরবেলা

ঘরে এ'সে শুয়ে একটু ঘুমাওনা? ডাক্তার বোলে গেছেন, আহা-রের পর বিশ্রাম দরকার। সারাদিন লেখাপড়া করিলে, ব্যারাম যে বাড়্‌বে।"

কমলিনী। দিনের বেলা ঘুম, হয় না তো, আমি কি করিব? ঘুমের উপর তো জোর নাই?

মা। আমি তোমার ভালোর জন্যই বলি। দুপুর বেলা সহজ প্রাণ আইঢাই করে,—তোমার ত অসুখ-শরীর। এস, আমার সঙ্গে এস—খানিক শোওসে।

কমলিনী। এখন আর শোব কখন্? চারিটার সময় মাষ্টার পড়াতে আস্‌বে যে; শোবার কি আর সময় আছে?

মা। এই ত দুটো বেজেছে বৈ ত না; চারটাকে এখন ঢের দেরী। মাষ্টার বাবু পড়াতে এলে, ঘুমে থেকে আমি তোমাকে উঠিয়ে দেবো।

কমলিনী। না,—তিনি রাগ কোর্‌বেন; আমার পড়া তৈয়ারি না হ'লে, তিনি যে রাগ করেন!

মা। বাছা, রোগ হ'লে আমাকেই ভুগতে হয়। শরীরটা আগে, না পড়া আগে? শিরঃপীড়াটা একটু কমে যাক্, তারপর দিন রাত পড়ো।

কমলিনী। মা, তুমি আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিওনা। এইরূপ দৌরাত্ম্যেইত আমার মাথাধরা রোগ জন্মিয়াছে। হৃদয়-কমল-উত্থিত নিগূঢ় ভাব-নিচয়ের গতি-প্রতিরোধ করিলে, ডাক্তারি মতে, সেই বদ্ধ-ভাবরূপ বিষে, শরীর দূষিত হয়। তখন মস্তিষ্কে বিকার উপস্থিত হয়। আর্য্য-রমণীর ধমনীতে তখন শোণিতনিচয় ইতস্তত প্রবল পরাক্রমে প্রধাবিত হয়। শিরঃপীড়ার ইহাই আদি এবং মূল কারণ। আপনি যদি আমাকে আর দুই-বার "শোও, শোও" বলিয়া জেদ করেন, তাহা হইলে, আমার এখনি মাথা ধরিবে।

মা। তা বাছা, তুমি যাতে ভাল থাক, তাই তুমি কর।

এই বলিয়া জননী প্রস্থান করিলেন। কন্যা আবার খড়ি

দেখিলেন,—তিনটা বাজিতে এখনও দশমিনিট বিলম্ব। কাঁটা সরাইয়া দিয়া তিনটা বাজাইলে প্রকৃতই তিনটা বেলা হয় কি না,—গুম্ হইয়া একমনে তাহাই বোধ হয় তিনি ভাবিতে লাগিলেন। সূর্য্যের বশে ঘড়া হইল কেন? ঘড়ার বশে সূর্য্য চলিল না কেন? বিধাতার এমন কুনিয়ম কেন? ঘড়ার অধীনতা, দাসত্ব, পরমুখপ্রেক্ষিতা, কি সাম্যনীতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে না? সূর্য্য কি ব্রাহ্মণ, ঘড়া কি শূদ্র? তাই আজও এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতে ঘড়া, সূর্য্যের পদানত থাকিবে? এ দাসপ্রথা, এ পাপ-ব্যবসা এদেশে আর কত দিন চলিবে? এখানে কি কোন উইলবারফোর্স আজও জন্ম গ্রহণ করেন নাই? কমলিনী ভাবনা-সাগরে ডুব দিলেন।

ডুব দিয়া, পাতাল পানে তলাইয়া যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার করপদ্মে এক প্রকাণ্ড চৌকো লেফাফা আসিয়া পৌঁছিল। খামের একপার্শ্বে ইংরেজীতে কেবল এইটুকু লিখিত আছে,—KAMALINI

55 ——— Lane, Calcutta.

ভিতরে বাঙ্গালা।—

সুহৃদ্বরে!

পরমপিতা পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, হৃদয় পবিত্র করুন, দেহ সুস্থ রাখুন! চারিটার সময় তোমায় শিক্ষা দিবার জন্য, যাইতে সক্ষম হইলাম না। চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটী করি নাই,—অভাবনীয় বিবিধ বন্ধ সত্ত্বেও, নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় উপনীত হইতে পারিলাম না। অপরাধ ক্ষমা করিও। সন্ধ্যার একটু পরেই পৌঁছিব। তোমার পাঠে ব্যাঘাত দিলাম বলিয়া আমি দুঃখিত, কাতর এবং মর্ম্মাহত। আমার দোষ লইওনা। এই পত্রের উত্তর দিয়া আমার মনপ্রাণ শান্ত করিলে বড়ই অনুগ্রহ করা হয়।

তোমারই নগেন।

রমণী এই পত্র পাইয়া অবশ্যই নিতান্ত ব্যথিতা হইলেন। অবশ্যই প্রথামত উষ্ণদীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন, কিন্তু দুঃখ এই, সে শ্বাসবায়ুর শব্দ কেহ শুনিল না।

কমলিনী ভাবিতে লাগিলেন, পত্রের উত্তর দি, কি না দি! খুব ক্রোধের বশীভূত হইয়া বলিলেন, আমি আর পত্র লিখিব না। কিন্তু তাঁহার সে রাগের সান্ত্বনা করিবার কেহই নাই দেখিয়া, তিনি আবার মনে মনে বলিলেন, আচ্ছা, এবার এই শেষপত্র লিখিলাম, আর কখন লিখিব না।

সুহৃদ্‌বর!

আমি আপনাকে গুরুর মত দেখি। এ নারী-জন্মের আপনিই আমার শিক্ষক। গুরুদেব! অধীনীর প্রতি আপনার কৃপা কম হইল কেন? নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া আপনি আমায় অমৃতময় বাক্যে উপদেশ দিবেন, সেই আশায় আমি বসিয়া আছি। আশায় নিরাশ হইলে বুক ভাঙ্গিয়া যায়। আপনার বিশেষ কাজ থাকিলে আসিয়া কাজ নাই। কারণ, আপনার কোনরূপ ক্ষতি হইলে আমার কষ্ট হয়। আমি আপনার রূপ কল্পনা করিয়া, আপনার মূর্ত্তি গড়িয়া, হৃদয়-রাজ্যে বসাইব। সেই মূর্ত্তিকেই গুরুদেব বলিয়া, প্রণাম করিয়া, আমি শেলি পাঠ আরম্ভ করিব।

চিরদুঃখিনী কমলিনী।

এই পত্র ভৃত্য লইয়া গেল। কমলিনী আবার সেই ল্যাজবিশিষ্ট চেয়ারে গিয়া শুইলেন বাঁ হাতে কেতাব ডান হাতে পেনসিল, চক্ষু মুদ্রিত।

এমন সময় আর একখানি পত্র আসিয়া পৌঁছিল। পত্র দিয়া দ্বারবান জিজ্ঞাসিল, "ডাক্তার বাবুকা আদ্‌মী খাড়া হ্যায়, আপ বোলিত জবাবকে ওয়াস্তে খাড়া রহে।" কমলিনী পত্র খুলিতে খুলিতে উত্তর দিলেন, "আবি রহেনে বোলো।"

দ্বারবান সেলাম করিয়া চলিয়া গেল সেই পত্রের অভ্যন্তর প্রদেশে এইরূপ লেখা ছিল।—

প্রিয় ভগিনি!

অদ্য তোমার মাথাধরা ব্যারামটা কেমন আছে, জানিবার জন্য বড় উৎসুক হইয়াছি। অদ্য তোমাদের বাড়ী আমার যাওয়া দরকার হইবে

কি? যাইব কি? অতি অল্প পরিমাণ মাথা ধরিলে, তৎক্ষণাৎ লিখিয়া পাঠাইও; আমি সকল কাজ ছাড়িয়া যাইব। তোমার দাদা কবে আসিবেন?

তোমারই মহেন্দ্র।

কমলিনী ঝটিতি এই পত্রের এইরূপ উত্তর লিখিয়া দিলেন;—

প্রিয় ভ্রাতা!

আপনার অনুগ্রহপত্র পাইয়া পরম প্রীত হইলাম। আমার উপর আপনার যেরূপ কৃপাদৃষ্টি, যেরূপ যত্ন, যেরূপ স্নেহ, তাহাতে আমার মাথাধরা ব্যারাম অচিরে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। আপনিই এ জগতে আমার একমাত্র পরমবন্ধু; প্রকৃত শান্তি, সুখ, স্বচ্ছন্দ আপনিই আমাকে প্রদান করিলেন। কিন্তু এরূপ অনুগ্রহদৃষ্টি চিরদিন থাকিবে কি? ভগবান! আমায় অভয় দিন।

ভগবানের ইচ্ছায় এখন একটু ভাল আছি। যদি বিশেষ মাথা ধরে, তবে ৭টার পর ডাকিতে পাঠাইব।

তোমার দুঃখিনী ভগিনী।

বার বার তিনবার। তখন আর একখানি পত্র আসিয়া পৌঁছিল। পত্রাকৃতি বড়ই জমকাল,—চারি দিকে সোণার হল্-করা,—এবং শিরোদেশে উড়নশীলা, বিবসনা পরীর ছবি। পত্রের অভ্যন্তর এবং বাহ্যপ্রদেশ হইতে, আতরগোলাপের সুগন্ধ বাহির হইতেছে। পত্রখানি পদ্যে;—

কেন ভালবাসি, কি দিব উত্তর?
নীল নয়নের তারা ফেটে পড়ে বারিধারা,
ভাসে মুখ, ভাসে বুক, ভাসয়ে কোমর।
কেন হায়! ভালবাসি কি দিব উত্তর!!

হাসে চাঁদ গগনের কোলে,
হাসে ফুল এ মহীমণ্ডলে,
ঝরে মধু কমলের ফুলে,
বহে বায়ু বাসন্তী-হিল্লোলে,

গায় পিক সুধামাখা বোলে,
নাচে শিখী ঘন-ঘটা-রোলে,—
দাবানলে দহে সুধু অভাগা অন্তর
কেন ভালবাসি হায় কি দিব উত্তর।

ক্ষুদ্রমতি ক্ষুদ্রগতি, বামন বন্ধুর অতি,
দেহ মোর অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
দূরে অই গুরুগিরি, ধাপে ধাপে ধীরি ধীরি,
কেমনে উঠিয়া পাব ত্রাণ॥
কাঁদি তাই দিবানিশি ভাবিয়া ঈশ্বর।
কেন ভালবাসি তোমা, কি দিব উত্তর॥

পঙ্কজ প্রফুল্ল কেন অরুণ উদয়ে,
কুমুদিনী ফুটে কেন চাঁদ-মধু-পিয়ে,
বসন্তে কোকিল কেন কুহু কুহু করে,
মলয় অনিল কেন ঝুরঝুর্ ঝরে,
কমলিনী পানে কেন ধাইছে ভ্রমর
কেন ভালবাসি প্রিয়ে! কি দিব উত্তর!

কি দিব উত্তর?—চাই আকাশের পানে;
কি দিব উত্তর?—চাই পাতালের পানে;
কি দিব উত্তর?—হেরি সুনীল সাগর;
কি দিব উত্তর?—হেরি হিমগিরিবর;
চারিদিক অন্ধকার—ঘোর, ঘোরতর,
কেন ভালবাসি প্রিয়ে কি দিব উত্তর।

ব্রহ্মাণ্ড কাগজ যদি, মৈনাক লেখনী,
কালী তোয়োনিধি কিম্বা নয়নের পাণি,
সময় অনন্ত যদি, শ্রম নিশিদিশি,
তবেত এ উত্তর দিব, কেন ভালবাসি।

কিম্বা যদি হ'তো দেখা,—বিরল বাসরে,
সুধাংশুবদনি! সুধু, অৰ্দ্ধদণ্ড তরে!
নখে করি, বুক চিরি, খুলিয়া অন্তর,
কেন ভালবাসি, তার, দিতাম উত্তর।

দেখাতাম হাড়ে হাড়ে তব নাম লেখা,
দেখাতাম ত্বকে ত্বকে তব ছবি আঁকা;
দেখাতাম প্রেমতরী শোণিত-সাগরে,—
জীবাত্মা নাবিক তার আছে হাল ধরে;
দেখাতাম হৃদিমূল—শরতের শশী,
তবে ত উত্তর হ'তো—কেন ভালবাসি।

এই শেষ-লিপি, তবে,—বিদায়!—বিদায়!
সাজিব সন্ন্যাসী, মাখি, ভস্মরাশি গায়।
গেরুয়া বসন পরি, করে কমণ্ডলু ধরি,
ভ্রমিব ভারতমাঝে নগরে কাননে,—
নদীবক্ষে গিরিশৃঙ্গে, সাগরতরঙ্গভঙ্গে,
গাইব তোমার গান আনন্দ-আননে।

যাগ যজ্ঞ হোম, জপ তপ মন্ত্র তন্ত্র,—
সেই নাম, সেই নাম, সেই নাম মন্ত্র—
সে নাম সঙ্গের সাথী—সে নাম ঈশ্বর—
কেন ভালবাসি প্রিয়ে, কি দিব উত্তর!

শ্রীনবঘনশ্যাম।

এই পদ্যটী কেবল আপনার পাঠের জন্যই লিখিলাম। আপনি যদি ছাপাইতে অনুমতি দেন, তবে ছাপাইব। আর যদি লোক-সমাজে প্রচার করা, ইহা আপনার অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে ছিঁড়িয়া কুঁচি কুঁচি করিয়া ফেলিবেন। আজ দুই বৎসর পূর্ব্বে সেই অপূর্ব্ব গোলাপ ফুলটী আমার হাত হইতে ঈষৎ হাসিয়া, কাড়িয়া লইয়া, আপনি কোমল-নখ দ্বারা যেরূপ ধীরে ধীরে ছিঁড়িয়াছিলেন, এই পত্র

সেই ভাবেই ছিঁড়িবেন। পনের দিন কলিকাতায় রহিলাম তথাচ এক-দিনও দেখা হইল না—সে সকলই আমার দুরদৃষ্ট। এখন দূর দেশে চলিলাম, কবে ফিরিব জানি না।

শ্রীনবঘনশ্যাম।

কমলিনী, পত্র পাঠান্তে, প্রায় দশমিনিট কাল, আপন মনে গভীর চিন্তা করিলেন। শেষে উত্তর দিলেন, "ইহার উত্তর আজ নহে। আপনার কর্ম্মস্থানে, ডাকযোগে উত্তর পাঠাইব। এখন এইমাত্র বলিতে পারি, আমি নিরপরাধিনী অবলা।"

সংসারসুখ-বিরহিতা কমলিনী

তৃতীয় পত্রের উত্তর দিয়া, কমলিনী নীরবে সোফায় গিয়া শুইয়া রহিলেন। ভৃত্যকে বলিলেন, "জোরসে পাখা চালাও।" তৎপরে, তিনি, নয়ন দুখানি বুজিলেন।

কি কর্ম্মভোগ! দেখিতে দেখিতে, আর এক খানি পত্র আসিল। পত্র খানি, বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাসের লিখিত। যথা;—

"মহিলা-কুল-গৌরবে!

রমণীতে বিজ্ঞান বুঝিবে, ইহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া, আমার সে ভ্রমান্ধকার দূর হইল। আজ একমাস মধ্যে শারীর-বিজ্ঞানে তুমি যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছ, তাহা অত্যদ্ভুত। আর রসায়নেও তোমার দৃষ্টি প্রখর। আজ আমার শিক্ষা দেওয়া সার্থক হইল। কিন্তু একটা বড় অসুবিধা ঘটিয়াছে। সপ্তাহে কেবল একদিন বিজ্ঞান পড়িবার দিন নির্দ্দিষ্ট আছে; তাহাতে পড়া অতি অল্পই হয়। ইংরেজীসাহিত্য পাঠ, সপ্তাহে ছয় দিন হইয়া থাকে। একদিন সাহিত্য-পাঠ কমাইয়া, সপ্তাহে বিজ্ঞানপাঠ দুই দিন ধার্য্য করিলে ভাল হইত না কি? বিশেষ, সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞান কিছু গভীরতর বিষয়। চন্দ্রমুখি! এ বিষয়ে তুমি যাহা অনুমতি করিবে, তাহাই হইবে।"

অনুগত শ্রীনিত্যানন্দ দাস।

নিত্যানন্দ বাবু, বহুকাল বিজ্ঞানচর্চ্চায়, দু চারগাছি চুল পাকাইয়া, ক্রমশ প্রবীণত্বে পা দিয়াছেন। কমলিনী এ পত্রের এইরূপ উত্তর দিলেন ;—

"অদ্য আমার শরীর অসুস্থ। সুতরাং গভীর বিষয় আলোচনা করিবার অদ্য উপযুক্ত সময় নহে। কিন্তু আপনার কথা দিবানিশি আমার মনে জাগিয়া থাকিবে। শয়নে, স্বপনে, ভ্রমণে, ভবনে—কেবল ঐ কথাই ভাবিব। কারণ আপনার দ্বারা আমি যেরূপ উপকৃত হইতেছি, অন্যের দ্বারা সেরূপ নহে ;—আপনি ভিন্ন বিজ্ঞানের কঠোর অর্থ আর কে বুঝাইতে পারে ?

বিজ্ঞান-ভিখারিণী কমলিনী।

এমন সময়, উকীলবাবুর "ভেট", কমলিনীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। রজতথালে সন্দেস এবং গোলাপফুলের তোড়া। পত্রখানি গালামোহর করা। উপরে লেখা আছে, 'অন্যের পাঠ নিষেধ।' কমলিনী সেই পত্রখানি মনে মনে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পত্র-বাহক, এক টাকা বকৃশীশ পাইয়া বিদায় হইল।

উপরি উপরি চারিখানি পত্র লিখিয়া কমলিনী নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কোমল করপল্লব আড়ষ্ট হইল। আঃ উঃ, গেলাম, বাঁচিনা,—ইত্যাদি মিহি মিহি শব্দ তাঁহার মুখ-বিবর হইতে উত্থিত হইতে লাগিল।

তথাচ চারিটা বাজিল না। এমত স্থলে ঘড়ীর কল খারাপ হই-য়াছে, এরূপ অনুমান করাই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং কমলিনী, দ্বার-বানকে গির্জ্জার ঘড়ী দেখিতে পাঠাইলেন।

পাঠাইয়া, নিজ পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঘরটী ক্ষুদ্র। মধ্যভাগে একটী ছোট টেবিল ; তার দুধারে দুখানি কেদেরা ; পাশে একখানি বেঞ্চ। ঈষৎ দূরে খাট ; গদী আঁটা ; ধপ্‌ধপে চাদর বিছানো ; তদুপরি সরু, মোটা, পাতলা,—নানা রকমের ৫।৬ টী বালিস। বই-ভরা দুইটী ছোট আলমারি। কাগজ, কলম, দোয়াত। ছবি, দেওয়ালগিরি, ক্লকঘড়ী। কুঁজোয় কলের জল, বোতলে লাল ঔষধ, আলনায় ঝিলিডি তুয়ালে। ডিপের পান, খাতায় গান, বাক্সে হারমোনিয়ম্।

কমলিনী সেই নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া আপন মনে মহাকবিতা রচনা করিবার উপক্রম করিলেন।

প্রথম সেক্ষপীয়র খুলিয়া, তাহা হইতে সুচিকণ কাগজে ইংরেজীকবিতা উদ্ধৃত করিলেন,—

To be, or not to be, that is the question
whether 'tis nobler in the mind, to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them ?—To die,—to sleep,—
No more, and, by a sleep, to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to,—'tis a consummation
Devoutly to be wish'd. To die,—to sleep ;—
To sleep ! perchance to dream ; . ay, there's the rub ;

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া ইহার বঙ্গানুবাদ আরম্ভ হইল,—

হয়, কি, না হয়—মরি কিম্বা বাঁচি—প্রশ্ন
ইহাই এখন। হতভাগ্য কপালের
বিষমাখা-বাণ গায়ে ফোটে সদা,—
দুঃখের সমুদ্রঘোর, তরঙ্গসঙ্কুল !
উচ্চহৃদে রোধিব কি গতি তার ? কিম্বা
অনন্ত-আলয়ে দিব,—যত যত ক্লেশ !
মৃত্যু—নিদ্রা—আর কিছু নয়, ঘুমাইলে,—
হ্রাস হয়, হৃদয়বেদনা,—মাংসপিণ্ড
শরীরের শতেক যাতনা ;—এই ফলে
পূর্ণ হয় মনের কামনা। মৃত্যু—নিদ্রা !—
নিদ্রা বুঝি অসার স্বপন। এইখানে,
হায় ! হায় ! কাঁচাবাঁশে ধরিলরে ঘুণ।

লেখা শেষ হইলে, কমলিনী কবিতাটীর প্রথম-আধখানা খুলিয়া, দ্বিতীয়-আধখানা ঢাকিয়া টেবিলের উপর, অতি যত্নে রাখিয়া দিলেন। তথাচ সাহিত্য-শিক্ষক আসিয়া উপনীত হইলেন না। কমলিনী তখন জানেলার

নিকট গিয়া উর্দ্ধমুখী হইয়া নীল আকাশপানে তাকাইলেন; আকাশ ভাল লাগিল না। দক্ষিণ দিকের গবাক্ষ দিয়া রাজপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—জনতা, বিষবৎ বোধ হইল। অবশেষে, সেই নিজস্ব, নির্জ্জন ঘরের "সহজ-কেদেরায়" শুইয়া, শেলির গ্রন্থ বুকে রাখিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অমানিশার পর পূর্ণিমা, শীতের পর বসন্ত, দুঃখের পর সুখ—ইহাই স্বভাবের সুনিয়ম। কবি বলিয়াছেন,—

> দুখ সুখ সম্পদ বিপদ,
> কালচক্রে ঘোরে পদে পদ।
> তাহার মাঝেতে নর, করে বাস নিরন্তর,
> শৃঙ্খলেতে যথা চতুষ্পদ।

কিন্তু দুঃখের পর কমলিনীর সুখ নাই কি? আরও দেখ। অতি-গরমের পর, বারিবর্ষণে পৃথিবী শীতল হয়; ওয়াটার্লুর ঘোরতর সংগ্রামের পর, ইউরোপ-ভূখণ্ডে শান্তি বিরাজিত হয়। আর আজ, কমলিনীর হৃদয়ক্ষেত্রে যে, মহা-ওয়া-টার্লুর সংগ্রাম চলিতেছে, তাহার কি এখনও বিরাম হইবে না? হবে বৈ কি? নহিলে যে সংসার লয় হয়!

কাল পূর্ণ হইলে, দেখিতে দেখিতে, অদূরে নাগরের জুতাবিশিষ্ট পদের শব্দ, কমলিনীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কমলিনী কাণ খাড়া করিয়া, সেই অনুরাগে ধ্বনিত—জুতার সেই দপদাপ, ধপাধপ শব্দ শুনিতে লাগিলেন;—কাণ দিয়া সেই জুতা-মধুপান করিলেন। ক্রমে মনোমোহিনী, মধুময়ী, জুতা-ধ্বনি নিকটবর্ত্তিনী হইল,—ঘনত্বভাব ধারণ করিল,—দুধ যেন ক্ষীরে পরিণত হইল। তখন সেই শব্দের প্রসূতি পুরুষবর, সেই নিভৃত কক্ষের দ্বারদেশে সু-কোমল ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "আপনি বোধ হয় একবার উঠিয়া, খিল খুলিয়া দিতে; আপত্তি করিবেন না।"

কমলিনী অতি ধীরভাবে ঝিঁঝিঁ-আওয়াজে বলিলেন, "দিতেছি!—হা ঈশ্বর!"

খিল খোলা হইলে, সেই পরম পুরুষের মোহন মূর্ত্তি, নয়ন-পথের পথিক হইল। সে মূর্ত্তি কেমন?—

বদন মণ্ডল, চাঁদ নিরমল,
ঈষৎ গোঁফের রেখা।
বিকচ কমলে, যেন কুতূহলে,
ভ্রমর পাঁতির দেখা॥
আজানুলম্বিত, বাহু সুললিত,
কায়ের কনক আশা।
বক্ষ সুবিশাল, উপহাসে কাল,
অনন্ত প্রেমের বাসা॥

পুরুষের দীর্ঘ দেহে, রেশমের এক দীর্ঘ পার্শী-কোট বিলম্বিত। পরিধান,—ফরেসডাঙ্গার উৎকৃষ্ট কালাপেড়ে ধূতি। একগাছা খুব মোটা সোণার চেন, অর্দ্ধচন্দ্র রেখায় বুকে ঝুলিতেছে। অধর-ওষ্ঠ, লালবর্ণ। চোখ দুখানি, পটল-চেরা। মাথায়, চেরা-সীঁথি। শরীর হৃষ্টপুষ্ট,—মাংসল, অথচ স-সার। মুখটীতে সদা হাসি মাখানো। বয়স, পঁচিশ বৎসরের কম নহে। নাম, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইনি কলেজের অধ্যাপক এবং কমলিনীর সাহিত্য-শিক্ষক।

ছাত্রী এবং শিক্ষকে উভয়ে চারিচক্ষে শুভ সংমিলন হইলে,—নিতান্ত ম্লানভাবে কঠোর-ক্ষীণ স্বরে, ছাত্রী-কমলিনী, শিক্ষক-নগেন্দ্রকে বলিলেন,—"আপনি কি নিষ্ঠুর! নারীজাতীকে কষ্ট দিবার জন্যই বুঝি বিধাতা, পুরুষকে গড়িয়াছেন?

নগেন্দ্র। তা, আপনি আমাকে সবই বলিতে পারেন। আমার হৃদয়, পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন না হ'লে কি এরূপ অবস্থা ঘটে? আমি অকৃতী, অধম, ভীরু, কাপুরুষ! আপনার নিকট আমি শত অপরাধে অপরাধী।

কমলিনী। রাগ করিলেন নাকি?

নগেন্দ্র। রাগ করি নাই, দুঃখ করিতেছি! ভারতের কুসংস্কার, ভারতের কুনীতি, ভারতের কুপ্রথা দেখিয়া কেবল কাঁদিতেছি।

ছাত্রী-রমণী, শিক্ষক-পুরুষের কান্নার কথা শুনিয়া, নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন;—"আসুন আসুন, চেয়ারে বসুন।"

তখন নরনারী উভয়েই টেবিলের উভয় পার্শ্বস্থিত সেই চেয়ারে উপবেশন করিলেন। ধরাধামে যেন রতিকাম আবির্ভূত হইলেন।

চেয়ারে বসিয়াই, কমলিনী সেই সদ্যোজাত কবিতাটী লুকাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন। নগেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসিলেন, (কবিতার কাগজ, মায় কবিতা, আধাআধি, দেখা যাইতেছে)—"ও কি ও? কবিতা লিখিয়াছেন কি? দেখি, দেখি, কেমন কবিতা!

ক। না, না, এ অপনার দেখে কাজ নাই! ও কিছু নয়!

ন। আপনিত, কখনো কিছুই আমার নিকট গোপন করেন না। যাহা আমার জানিবার কস্মিনকালে সম্ভাবনা ছিল না; তাহাও আপনি আমাকে জানাইয়াছেন। আজ এ ভাব কেন?

ক। (একটু যেন অপ্রস্তুত ভাবে) আমিত কিছুই লুকাইতেছি না! (একটু গম্ভীর ও বিজ্ঞভাবে) যদি লুকাইব, তবে সুমুখে রাখিব কেন? যদি সুমুখেই রাখিলাম, তবে চাপা দিয়া রাখিলাম না কেন? লুকাই নাই,—দেখাইব না, ইহাই উদ্দেশ্য।

কবিতাটী তখনও আধাআধি খোলা,—

ন। (একটু হাসি হাসি মুখে) আচ্ছা, আমি এই কবিতার কাগজ ধরিলাম, আপনি কাড়িয়া লউন।

ক। সে সাধ্য আমার নাই। আপনার উপর আমি বল প্রকাশ করিতে পারি না। আর বাধা দিব না। আপনি পড়ুন,—কিন্তু দেখিবেন,—

ন। (কবিতা পাঠ করিতে করিতে)

হয়, কি না হয়—মরি কিম্বা বাঁচি—
প্রশ্ন ইহাই এখন—

অহহ! কি দুর্দ্দৈব! এ দারুণ বিষময় ভাব আপনার মনে উদয় হইল কেন? ও কোমল প্রাণে, ঐ প্রফুল্ল, পঙ্কজবৎ পবিত্র নির্ম্মল হৃদয়ে, এমন কি আঘাত লাগিল যে, আপনাকে অদ্যই শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন ভাবিতে হইল? কোন্ প্রেতাত্মা বিভীষিকা দেখাইয়াছে? কোন্ রাক্ষস গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে? কোন্ পশু আক্রমণ করিয়াছে? বলুন, শীঘ্র বলুন!

কমলিনী কথা কহিলেন না। নীরবে অধোবদনে রহিলেন। শেষে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া চোখে দিলেন।

ন। আমার শরীর, মন, আত্মা দিয়া যদি আপনার অভাব পূরণ করিতে পারি, তাহাতেও আমি রাজী আছি। আপনি কাঁদিবেন না, চোখের রুমাল খুলুন,—কি হইয়াছে বলুন।

কমলিনী চোখের রুমাল, ডান হাত দিয়া আরও আঁটিয়া ধরিলেন। বদন চাঁদখানিকে আরও অবনত করিলেন। ক্রমে মুখের সঙ্গে টেবিলের শুভসম্মিলন হইবার যোগাড় হইল।

তখন কাতর, গুণাকর মাষ্টার আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কমলিনীর কর-কমল ধরিয়া বলিলেন, "একবার মুখ তুলুন, একটী কথা কহুন—

এমন সময় সেই ক্ষুদ্র ঘরের দ্বারদেশের অদূরে পদশব্দ এবং মানব-কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইল। কমলিনী এবং নগেন্দ্র বাবুর মুখ, চোখ, নাক, কাণ, সেই দিক পানে ফিরিল। হঠাৎ অমনি রমণীরত্নের চোখ হইতে রুমাল খসিল, দেহের সেই অবনত ভাব ঘুচিল,—বাম হস্তে নোটবুক এবং দক্ষিণ হস্তে পেনসিল বিরাজিল। ওদিকে মাষ্টার বাবু, সম্মুখস্থিত সেক্ষপীয়রের হ্যামলেটখানি হাতে লইলেন, এবং তাহাতেই মনঃসংযোগ করিলেন। এই সব পার্থিব কার্য্য, পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে সম্পাদিত হইল। এদিকে সেই শব্দ এবং অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি, ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; মাষ্টারের হ্যামলেটে মনঃসংযোগ ততই অধিকতর বৃদ্ধি পাইল; কমলিনী নোটবুকে ততই বেগে মানে লিখিতে লাগিলেন।

তখন সেই মানব, গৃহ-দ্বারে ধাক্কা দিয়া বলিল,—"মাষ্টার মোশাই, আজ একটা একট্টা ক'সে দিন না?"

মাষ্টার তখন তদ্গতচিত্ত ধ্যানমগ্ন যোগী; পূর্ব্ব হইতেই কমলিনীকে উদ্দেশ করিয়া, পুস্তকের দিকে চাহিয়া বলিতেছিলেন,—"পৃথিবীতে যত কবি আছেন, তন্মধ্যে সেক্ষপীয়রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মিল্টন বলুন, বায়রণ বলুন, টেনিসন বলুন, সেক্ষপীয়রের কাছে কেউ নয়।

ক। আমার মতে সব চেয়ে শেলি ভাল,—

ন। শেলিও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার কবিতার মহিমা আমি এক-মুখে বর্ণন করিতে অক্ষম। তাঁহার একএকটী কবিতার জন্য আমি এক মিলিয়ান পাউণ্ড পর্য্যন্ত দিতে পারি।

ক। আমি সর্ব্বস্ব দিতে পারি।

ন। ঠিক! ঠিক! আপনিই শেলির প্রকৃত মহিমা বুঝিয়াছেন।—এ জগতে কয়জন শেলি বুঝিতে পারে?

এই সময় সেই মানব, গৃহের গুরুভারবিশিষ্ট স্ক্রীরিন বহু কষ্টে তুলিয়া, ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিয়া, ঘরে ঢুকিল। নগেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"এস এস,—বিপিনবাবু, কতক্ষণ? ব'স, ব'স।

বিপিন পাশের বেঞ্চে বসিল। সেই পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক এণ্ট্রেন্স ক্লাসে পড়ে।

বিপিন, কমলিনীর ছোট ভাই। তাহার স্বতন্ত্র গৃহশিক্ষক আছে। তবে কোন কঠিন বিষয় হইলে, বিপিন অধ্যাপক নগেন্দ্রের নিকট হইতে বুঝাইয়া লইয়া যায়।

অদ্য বিপিনের গৃহশিক্ষক আসেন নাই, এক্‌ষ্ট্রাটাও শক্ত। কাজেই বিপিন, স্কুল হইতে ঘরে আসিয়াই, তাড়াতাড়ি নগেন্দ্র বাবুর কাছে এক্‌ষ্ট্রা বুঝিতে আসিয়াছে।

বিপিন। মাষ্টার মোশাই! এক্‌ষ্ট্রাটা বড় শক্ত, কসে দিন ত? আজ কেউ ক্লাসে এটা কস্‌তে পারে নাই। হেডমাষ্টার বোল্লেন, তোমরা বাড়ী থেকে কসে এনো।

ন। তাইত, আমার বড় সর্দ্দি কোরেছে। কাল দিবো।

বি। না,—মাষ্টার মোশাই, পায়ে পড়ি মাষ্টার মোশাই, আজই বুঝিয়ে দিন না?

ক। হেঁরে বিপিন, তুই পাগল হলি নাকি? ওঁর অসুখ করেছে, সর্দ্দিতে মাথা কামড়াচ্চে,—দেখতে পাচ্ছিস না? এক্‌ষ্ট্রার জন্ত ভাবলে যে, ওঁর আরও অসুখ বাড়্‌বে।

বি। (ক্ষুণ্ণভাবে, ঈষৎ ক্রন্দনের সুরে) মাষ্টার মোশাই কেবল দিদির পড়াটাই বো'লে দেবেন, আমাকে কিছু বোলবেন না!

এই বলিয়া বালক প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল।

ন। নাহে বিপিন বাবু, রাগ করো না। কৈ, তোমার একৃষ্ট্রা দেখি। কাল বৈকালে নিশ্চয় বলে দেবো।

বালক একৃষ্ট্রা দেখাইল। নগেন্দ্র বাবু একৃষ্ট্রা কাগজে লিখিয়া, পকেট-জাত করিলেন। বিপিনচন্দ্র তখন প্রফুল্লমনে কক্ষ হইতে বাহির হইল।

আপদ-বালাই বিদায় হইলে, নগেন্দ্রনাথ পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "কমলিনি! আমার অন্তরে দাবানল জ্বলিতেছে। আপনি আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন, কিসে এরূপ দারুণ মনোব্যথা পাইলেন।"

ক। এমন জিনিস জগতে কি আছে, যাহা আপনাকে দেখাইব না; এমন কথা কি আছে, যাহা আপনাকে বলিব না; এমন ধ্যান কি আছে, যাহাতে আপনাকে ভাবিব না। কিন্তু অদ্যকার কথা বড় বিষম। আর ঐ ভয়াবহ কথা আপনাকে বলিয়াও কোন লাভ নাই। তাহাতে কেবল আপনার কষ্ট বৃদ্ধি হইবে। বাজার হইতে এখনি আমাকে বিষ কিনিয়া আনিয়া দিন, তাহাই সুধাবোধে আহার করিয়া, অদ্যকার এ দারুণ গাত্রজ্বালা নিবারণ করি।

ন। (অতি কাতর ভাবে) আপনি যদি ওকথা না বলেন, তাহা হইলে এখনি আমি বঙ্গোপসাগরের অনন্ত জলে ঝাঁপ দিব। আমার অন্তরাত্মা পুড়িয়া যাইতেছে; আপনি সেই কথামৃতে আমার প্রাণ শীতল করুন। যদি না বলেন, তাহা হইলে, অদ্যই নগেন্দ্রহীন জগৎ দেখিবেন।

ক। আমি জলহীন মৎস্য দেখিতে পারি, চন্দ্রহীন পূর্ণিমা-রজনী দেখিতে পারি, বায়ু-হীন পৃথিবী দেখিতে পারি, কিন্তু নগেন্দ্রহীন জগৎ দেখিতে পারি না। গুরুদেব! সখা! ভ্রাতা! মাথা না থাকিলেও যদি মানুষের কথা কওয়া সম্ভব হয়, চক্ষু না থাকিলেও যদি মানুষের দর্শন করা সম্ভব হয়, তথাচ আপনা ব্যতীত, আমার জীবিত থাকা সম্ভব নহে।

ন। মরি! মরি!! বিধাতার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এমন বিদ্যা বুদ্ধি

প্রতিভা কি নীরবে, নির্জ্জনেই বিলয়প্রাপ্ত হইবে? পারিজাত কুসুম কি মরুভূমেই ফুটিবে, মরুভূমেই শুখাইবে? কমলে! ভগিনি!—

কমলিনী চোখে রুমাল দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

বাহির হইতে এক নারীকণ্ঠ ডাকিতে লাগিল,—"কমল, ও-কমল, সন্ধ্যা হলো মা, কিছু খাবে এস মা!"

ক। (ঈষৎ ধীরে) বুড়ী মাগী জ্বলিয়ে খেলে! মায়ের ত আর কোন কথা নেই,—কেবল খেসে, আর ঘুমুসে। (উর্দ্ধস্বরে) মা, আজ আমার এখনও ক্ষুধার উদ্রেক হয় নাই। বিশেষ, মাষ্টার মোশাই পড়া দিচ্চেন,—এখনও পাঠ-শেষ হতে দেরী আছে!

মাতা ঘরের নিকট আসিয়া ধীর-স্বরে বলিলেন,—"এ ঘরের পরদা যে ভারি, সহজে সরান যায় না।"—

ন। (হ্যামলেট গ্রন্থে চিত্ত নিহিত করিয়া) বলুন দেখি,—'not a mouse stirring' অর্থ কি?

ক। not মানে না, a মানে এক, mouse মানে ছুঁচো, stirring মানে নড়েচড়ে বেড়ায়,—অর্থাৎ একটী ছুঁচোও তথায় নড়েচড়ে বেড়াইতেছে না।

ন। ইহার ভাবার্থ কি বুঝিলেন?

ক। সদ্গন্ধে সে স্থান আমোদিত। ছুঁচো থাকিলেই দুর্গন্ধ উঠে,—একটীও ছুঁচো নাই;—সুতরাং সদ্গন্ধে মজলিস্ ভুর্ ভুর্ করিতেছে।

ন। অতি সুন্দর অর্থ! কিন্তু অপরাপর টীকাকারগণ ইহার অন্য অর্থও করিয়া থাকেন,—

ক। তা করুন, তাতে আমার আপত্তি নাই।

ন। মহাকবি ব্যায়রণের জীবনচরিত কতদূর পাঠ হলো?—তাঁহার জীবনের যে যে স্থান সামঞ্জস্য করিতে পারিবেন না,—আমাকে বলিবেন। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝাইয়া দিব!

ক। ব্যায়রণ একজন অতি পবিত্র প্রেম-পরায়ণ মহোদয় পুরুষ। তিনি স্বর্গে গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মা আজও জীবিত আছে। তাঁহার জীবন্ত; সুন্দর কমনীয় ছবিটী কখন ভুলিব না,—

ন। ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্।

জননী ইতিমধ্যে গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"মা, একটু কিছু খাওসে!"

ক। না,—কিছু খাবো না—কতবার এক কথা বল্‌বো? পড়া না সেরে, আমি খাবো না।

মা। মাথা টাথা ধরে নাইত?—আছ ভাল?

ক। (স্বগত) জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ কর্‌লে (প্রকাশ্যে)—বেশ আছি, এখন কোন ব্যারাম নাই। (মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি) Magazine শব্দের Derivationটা কি? ইহা আমাদের ভারতবর্ষীয় কথা নয় কি?

ন। সে কথা পরে বলিব। শব্দের উৎপত্তি, গতি, স্থিতি এবং প্রণয় অতি আশ্চর্য্যরূপে সংঘটন হয়।

ক। ঔপন্যাসিক সম্প্রদায়ের মধ্যে, এ মহীমণ্ডলে, ভিক্টারহিউগো প্রধান নয় কি? তাঁহার "লা-মিজারেবল" যতই পাঠ করি, ততই আনন্দ সাগরে ডুবিতে থাকি।

জননী তখন "আসি মা" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

ন। চমৎকার বুদ্ধিমতি! আর কাল বিলম্ব করিবেন না; সেই গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া আমাকে জীবন দান করুন—আমার প্রাণ যায় যায় হইয়াছে,—

ক। (যোড় হাতে) গুরুদেব! আমায় ক্ষমা করুন! সে কথা শুনিলে, আপনার কোমল হৃদয়-পদ্মে অতিশয় ব্যথা উপস্থিত হইবে। এ ভিখারিণীর মর্ম্মযাতনার অংশভাগী হইয়া আপনার লাভ কি?

ন। এখনি যদি শক্তিশেল বুকে লাগিয়া, আমার হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িয়া যাইত, তাহা হইলেও আমার এত অধিক যাতনা হইত না,—আমাকে যদি সেই গোপনীয় কথাও না বলেন, তাহা হইলেও, এত যাতনা হয় না; কিন্তু আপনার ঐ শেষ কথা,—"অংশভাগী হইয়া আপনার লাভ কি?"—ঐ কথারূপ ব্রহ্মাস্ত্রে আমার দেহ ভস্মীভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—আমি মরিলাম!

নগেন্দ্রনাথ তখন পকেট হইতে রুমাল লইয়া যথারীতি চোখে দিলেন।

কমলিনী দাঁড়াইয়া উঠিলেন; ধীরে ধীরে গজেন্দ্র গমনে, নগেন্দ্রের পার্শ্বে গিয়া রুমাল খুলিয়া লইলেন, এবং নিজ অঞ্চলের কোণ দিয়া, অতি যত্নে তাঁহার চোখ মুছাইয়া দিলেন। নগেন্দ্র পকেট হইতে দ্বিতীয় রুমাল বাহির করিয়া, আবার চোখে দিলেন; কমলিনী আবার তাহা খুলিয়া লইলেন। শেষে ছাত্রী, শিক্ষকের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "প্রভো! ক্ষান্ত হউন! অধীনীর অপরাধ হইয়াছে; ক্ষমা করুন। আমাকে আপনি অবিশ্বাসিনী ভাবিবেন না। আপনার কাছে কোন কথাই গোপন নাই। আজই হৃদয় বিদারণ করিয়া দেখাইব, যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মধ্যে, কেবল এক ব্যক্তিই আমার হৃদয়ের অধিপতি হইয়া বসিয়া আছেন—

ন। ধন্য! ধন্য! রমণী-রত্ন মধ্যে আপনিই কহিনূর, রমণী-তারাগণ মধ্যে আপনিই পূর্ণচন্দ্র, রমণী-পুষ্প মধ্যে আপনিই পারিজাত, রমণী-পর্ব্বত মধ্যে আপনিই হিমালয়, রমণী-নদী মধ্যে আপনিই ঐরাবতী, এবং রমণী-বৃক্ষ মধ্যে আপনিই শাল্মলী তরু।

ক। আপনি প্রস্তুত হউন; সেই গূঢ় কথা কাণে কাণে বলিব।

নগেন্দ্রনাথ তখন আপন মুখ; গণ্ডদেশ, নাসিকা, কাণ,—কমলিনীর কমলমুখের নিকট লইয়া গেলেন। জগতে, একস্থানে, যেন মাণিকযোড় দুখানি চাঁদ ফুটিয়া উঠিল। নারীমুখ, নর-গণ্ডদেশে স্থাপিত হইল, সেই নিভৃত পবিত্র কক্ষে, সেই নিগূঢ় পবিত্র কথা, পবিত্র মুখনিঃসৃত হইয়া, পবিত্র কর্ণে পবিত্র সুধাবৎ ঢালিত হইতে লাগিল। সমুদ্রমন্থন-কালে, ধন্বন্তরি স্বয়ং যে সুধার কলস মাথায় করিয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা হইতেও, বোধ হয়, এ সুধা খাঁটি। নগেন্দ্রনাথ সুধাপানে পুলকে পূর্ণ হইয়া বলিলেন, "কমলিনি! আপনার কোন ভয় নাই। কথা গুরুতর বটে, কিন্তু এ নগেন্দ্র জীবিত থাকিতে, আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। আপনার প্রফুল্ল-কমলবৎ মুখমণ্ডল এখন হাসি-ময় দেখি-লেই নগেন্দ্র-জীবন শীতল হয়।—

ক। হাসি?—মরুভূমে বরফ! পর্ব্বতে পদ্ম! গরলে অমৃত! অমা-নিশায় চাঁদ! আপনি অদ্য আমার নিকট হইতে নিতান্তই অপ্রাকৃতিক

বস্তু প্রার্থনা করিতেছেন। আমার হৃদয়ে তরঙ্গ নাই,—বুদ্বুদ উঠিবে কিরূপে?

ন। (স্বগত) কমলিনীরই সাহিত্যপাঠ সার্থক হইয়াছে। (প্রকাশ্যে) সমস্তই যথার্থ, কিন্তু আমার মন বুঝে কে?

ক। সে যাহোক, কথার আর সময় নাই; এক্ষণে আমাদিগকে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। কাল-বিলম্ব করিবেন না।

ন। অতি উত্তম কথা।

ক। বিপদের সময় সকল বন্ধুবান্ধবের সহিতই পরামর্শ করা উচিত। ৫টা বাজিয়া গিয়াছে। আপনি শীঘ্র ডাক্তার বাবুর বাসায় যান। মহেন্দ্র-বাবুকে অনতিবিলম্বে এখানে আসিতে বলুন। সেখানে আপনি তাঁহার নিকট এ গূঢ় কথার কোনও উল্লেখ করিবেন না,—সমস্ত কথা আমি তাঁহাকে এখানে গুছাইয়া বলিব। আমি তাঁহাকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়া দিতেছি, আপনি দ্রুতপদে গমন করুন—বড়ই সঙ্কটকাল।

নগেন্দ্র বাবু গমনোদ্যত হইলেন। কমলিনী চোখে রুমাল দিয়া, দক্ষিণ-করে নগেন্দ্রের হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"আপনি নিতান্তই যদি চলিলেন;—আমার সহায় থাকিবে কে? আমি নিতান্ত মন্দভাগিনী,—একাকিনী ঘরে থাকিতে আমার হৃদয় ভয়ে কাঁপিতে থাকে। আপনি আর একটু বসুন—আমি ডাক্তার বাবুকে ডাকিবার জন্য চিঠি লিখিয়া লোক পাঠাইয়া দি—তিনি আসিলেই আপনি যাইবেন।

ন। আচ্ছা, তাহাই হউক।

তখন ভৃত্য, পত্র লইয়া ডাক্তার মহেন্দ্র বাবুকে ডাকিতে গেল। ডাক্তার-গৃহ একরশী পথমধ্যে অবস্থিত হইলেও,—ক্রমে ২৫ মিনিট সময় অতীত হইলেও, মহেন্দ্র বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন না। কমলিন, নগেন্দ্র বাবুকে বলিলেন, "আপনি গিয়া শীঘ্র মহেন্দ্র বাবুকে পাঠাইয়া দিন। আর কল্য প্রাতঃকালে যেন আপনার সাক্ষাৎ পাই। সম্ভবত সেই সময় উকীল বাবুও আসিবেন। গুরুদেব! আপনিই আমার সহায়! আপনিই আমাকে রক্ষা করুন,—এ সংসারে আমার আর কেহই নাই।"

নগেন্দ্রনাথ বীরপুরুষের মত, একটু মুরুব্বিআনা-ভাবে হাসিয়া বলিলেন, "এই নগেন্দ্রনাথের দেহের রক্ত-মাংস-অস্থি একত্র থাকিতে আপনার কোনও ভয় নাই—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

এইরূপে কমলিনীর সাহিত্য-শিক্ষক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটা হইতে সন্ধ্যা পৌণে ছয়টা পর্য্যন্ত; পাঁচ কোয়াটার-কাল; ছাত্রী-কমলিনীকে সাহিত্য-শিক্ষা প্রদান করিয়া, দ্রুতপদে গৃহে হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কমলিনীর চারি প্রহরে চারি রকম বেশ। যথা, প্রাতঃকালিক, দ্বিপ্রহরিক, বৈকালিক এবং নৈশিক। প্রভাতী বা সত্যযুগের পোষাক অতি সহজ;—একখানি নরুণপেড়ে কাপড়, মলমলের একটী পিরিহাণ, এবং চটী জুতা। তার পর, ক্রমোন্নতি আরম্ভ হয়। কমলিনীর দ্বিপ্রহরিক এবং বৈকালিক—ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগের বসন ভূষণ ক্রমশ বিচিত্র হইতে বিচিত্র-তর। অন্তিমে, নৈশিক বা কলিযুগের বস্ত্রালঙ্কার, চরম উন্নতি প্রাপ্ত হয়।

ঘড়ী খুলিয়া ৬টা বাজিয়াছে দেখিয়া, কমলিনী সেই বৈকালিক বসন পরিত্যাগ করত, সেই অপূর্ব্ব নৈশিক পোষাক পরিধান আরম্ভ করিলেন। সে বসনের বিপরীত বাহার কেমনে বর্ণন করিব? লাল, নীল, পীত, সাদা, কালো, সবুজ, পেঁষুটে,—কত রঙের নাম করিব?—আর জানিই বা কত? সে ঝক্‌ঝকে, রগ্‌রগে পোষাকের পানে, তাকায় কে?—যেন মেঘ-দর্শনে ময়ূর বিবিধবর্ণে রঞ্জিতপুচ্ছ প্রসারিত করিয়া মৃদু-মৃদু নাচিতেছে,—অথবা যেন রামধনু নবরাগে উদিত হইয়া, আকাশ-পটে বিরাজ করিতেছে। ফলকথা, সে ব্যাপার একটা অনি-র্ব্বচনীয় 'যাচ্ছেতাই' কাণ্ড। তদীয় অঙ্গের কোন প্রদেশে সাঁচ্চার কাজ ঝিলি ঝিলি করিতেছে; কণ্ঠে একখণ্ড হীরক দপ্‌ দপ্‌ দপিতেছে; বাহুতে বলয় ঝক্ ঝক্ ঝকিতেছে; গলায় ভুবনভুলানী বেলফুলের মালা সুগন্ধ বিত-রণ করিতেছে। শিরোপরি, কুণ্ডলীকৃত কুন্তলে অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত গোলাপ যেন বলিতেছে 'যতই সাধ' আজ আর কিন্তু ফুটিব না।' নবীন নিতম্বে দোদুল্যমানা মেখলা যেন নেচে নেচে বলিতেছে, "কোন্ মূর্খ বলে, ইহ-সংসারে স্বর্গরাজ্য নাই?—পরকাল ত, ভুয়াবাজী।" আর সেই অবন-তাঙ্গীর ধীর, মন্থর, গজেন্দ্রগমন,—সেই হরিণনয়নীর বিলোল, বিলাসময়ী অপাঙ্গদৃষ্টি—সেই চন্দ্রমুখীর হাসি-মাখানো রাঙ্গা রাঙ্গা অধর-ফুলখানি—কমলিনীর এই তিন মহাসামগ্রী দেখিয়া মনে হয়, আমি উঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িনা কেন,—চরণ-প্রান্তে প্রাণ সঁপিনা কেন,—মরিনা কেন?

এইরূপ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া কমলিনী হঠাৎ একবার দ্রুতপদে, ত্রিতলে, ছাদে উঠিয়া গেলেন। তথায় পাঁচ মিনিট কাল যেন মৃদুমধুর মলয়ানিল সাহায্যে বসন্ত-ব্রততীর ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া, খেলিয়া, আবার তিনি নীচে নামিলেন। তখন নিজ নিভৃত কক্ষে গিয়া, সোফায় অৰ্দ্ধশায়িত হইয়া, পকেট হইতে একখানি বাঁধান ক্ষুদ্র পুস্তকবৎ খাতা বাহির করিয়া, বুকের উপর রাখিলেন। অবশেষে, বামকর দ্বারা কপাল টিপিয়া ধরিয়া, মাঝে মাঝে "আঃ, উঃ, মোলাম, গেলাম, মাথা গেল,—আর বাঁচি না" ইত্যাকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কখন বা সেই গানের খাতা দেখিয়া তিনি মনে মনে গান মুখস্থ করিতে লাগিলেন ;—

মহড়া।

যৌবন জনমের মত যায়।
সে তো আসা-পথ নাহি চায়॥
কি দিয়া গো প্রাণসখি, রাখিব উহায়॥
জীবন যৌবন গেলে আর ;
ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার ;
বাঁচিতো বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়॥

চিতেন

গেল গেল এ বসন্ত কাল, আসিবে তৎকাল ;
কালে হলো কাল এ যৌবন কাল,
কাল পূর্ণ হলে রবে না,
প্রবোধে প্রবোধ মানে না।
আমি যেন রহিলাম তার অসার আশায়॥

অন্তরা।

হায় ষোলকলা পূর্ণ হলো যৌবনে আমার,
দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে বিফলেতে যায়।

অন্তরা।

কৃষ্ণ পক্ষ প্রতিপদে হয় শশিকলা ক্ষয়।
শুক্ল পক্ষ হয়, পুনঃ পূর্ণোদয়।

যুবতীর যৌবন হলে ক্ষয়,
কোটি কল্পে পুনঃ নাহি হয়;
যে যাবে সে যাবে, হবে অগস্ত্য গমনপ্রায়।

কন্যার শিরঃপীড়া উপস্থিত; জননীর কাণ সেই দিকে গেল। মাতা, কন্যার ঘরে গিয়া বলিলেন, "মা, কমল! আবার কি মাথা ধরিল?—একটা জলপটী কপালে দিয়ে দিব কি?

ক। না, মা, তোমার দিয়ে কাজ নাই। ডাক্তার বাবুকে ডাকতে পাঠিয়ে দাও, তিনি এসে জলপটী দেবেন; অথবা রোগের অন্য কিছু ব্যবস্থা করিবেন।

মাতা। লাবেণ্ডারের শিশাটা ততক্ষণ দিব কি?

ক। আচ্ছা, তবে তাই দাও—

জননী তখন, লাবেণ্ডারের শিশা লইয়া, কন্যার হাতে দিতে গেলেন। দেখিলেন, কন্যার সম্মুখে একখানা পুস্তক খোলা।

মাতা দুঃখিতান্তকরণে বলিলেন, "দেখ বাছা, সকল সময়েই কি পড়িতে হয়? তোমার শরীরে দারুণ রোগ জন্মেছে। অমন ক'রে সারাদিন পড়লে-শুনলে, রোগ আরাম হবে কেন, মা? তুমি আমার কোন কথা শোন না, তাই ত মা, তোমার অসুখ বাড়ে!

ক। মা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না; সকল পুস্তক পাঠেই কিছু, মাথা ধরে না—এ পুস্তকখানি শিরঃপীড়ার একরকম ঔষধ,—বরফবৎ ঠাণ্ডা! মা, তুমি ডাক্তার বাবুকে এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো।

মাতা। (ঈষৎ রাগভরে) আজই আমি ডাক্তার বাবুকে এ সব কথা জিজ্ঞাসা করিব। তিনি নিষেধ করিলে, তোমাকে একখানি কেতাবও পড়িতে দিব না—

ক। তুমি যতই আমার সেবা শুশ্রূষা করো, তোমার মেয়ে কিন্তু আর বাঁচবে না,—এ দারুণ যন্ত্রণা আর কদিন সহিব? (মাথা টিপিয়া, "আঃ, উঃ, মোলাম," করণ।)

জননী শুনিয়াছিলেন, হার্মোনিয়ম বাজাইলে মাথা ধরা সারে। সেই বাদ্যযন্ত্রের মধুর রবে, শিরঃপীড়া উড়িয়া পালায়। ডাক্তার বাবুও মধ্যে

মধ্যে, মাথা ধরার জন্য এই ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন। জননী অতি কাতর-ভাবে বলিলেন "তবে মা, বিপিনকে একবার সেই হারমোনিমটে বাজাতে ব'ল্‌ব কি? মা, আমি বেঁচে থাক্‌তে তোমার ভাব্‌না কি! তোমার জন্য আমি দশহাজার টাকা খরচ ক'রে ডাক্তার দেখাবো,—তুমি আমার একটী মেয়ে; তোমার কোন কষ্ট কি আমি দেখ্‌তে পারি মা?"

জননীর চোখ দিয়া এক আধ ফোঁটা জলও পড়িতে লাগিল।

ক। তবে এখন তাই বিপিনকে দিয়ে ওঘর থেকে বড় হারমোয়নিমটা পাঠিয়ে দাও। আর, মা, তোমার পায়ে পড়ি, শীঘ্র ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন্‌তে বল।

জননী প্রস্থান করিলেন। কমলিনী তখন সেই নির্জন ঘরে আবার অন্য একটী গান মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিলেন;—

মহড়া।

মনে রৈল সই মনের বেদনা!
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি বলা হলো না
শরমে মরম কথা কওয়া গেলনা।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে।
সখি ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে,
নারী জনম যেন আর করে না।

চিতেন।

একে আমার এ যৌবন কাল,
তাহে কাল বসন্ত এলো।
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।
যখন হাসি হাসি সে আসি বলে,
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নের জলে;
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ধরো না।

মহড়া।

তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম স্বজনি;
অনা(য়া)সে প্রবাসে গেল সে গুণমণি।
একি সখি হলো বিপরীত, রেখে লজ্জার সম্মান,
মদন দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ,
যদি সে হলো নিদয়, লইল বিদায়,
তবে যেন সখি প্রাণও রহেনা।

ডাক্তার বাবুকে ডাকিবার জন্য আর লোক পাঠাইতে হইল না। সেই অট্টালিকার ফটকের নিকটেই ডাক্তার-মূর্ত্তি দেখা গেল। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়। আকৃতি কিঞ্চিৎ খর্ব্ব। রঙটা কেমন মেটে-মেটে, ধুড়া-ধুঙা। কোটরবাসী চোখ দুটী উজ্জ্বল। নাকটী টিকলো। সম্মুখভাগের দাঁত দুটী একটু উঁচু-উঁচু। গঠন খুব পাকা—হাড়েমাসে জড়িত, খুব শ্রমসহিষ্ণু এবং কর্ম্মক্ষম বলিয়া বোধ হয়।

মহেন্দ্র বাবুর পরিধান,—সাদা জিনের পেণ্টালুন, কালো আলপাকার চাপকান এবং চোগা। মাথায় মখমলের টুপী। বক্ষে সোনার চেন ঘড়ী। ডান হাতে পিচের ষ্টিক; আর, বামহস্তে সেই মোহনবাঁশী—"ষ্টিথেস্‌কোপ।"

মহেন্দ্র বাবু শুধু ডাক্তার নহেন। এ বাড়ীর সহিত কি-একটু তাঁহার সম্পর্কও আছে। সেই সম্পর্কের বশে, তিনি কমলিনীর মাতাকে মা বলিয়া সম্বোধন করেন। জননীও তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় আদর, অভ্যর্থনা, স্নেহ করিয়া থাকেন।

মহেন্দ্র বাবু হাসিতে হাসিতে গৃহপ্রবেশ করিয়া সম্মুখে কমলিনীর মাতাকে বলিলেন, "মা, আজ আবার কি সংবাদ? বাড়ীর সকলে ভাল আছেন ত?"

মাতা। আমার কমলের আজ আবার অসুখ বেড়েছে। তুমি আমার পেটের ছেলের মত, তোমাকে আর বেশী ক'রে কি বল্‌বো?—

মা। আমাকে আপনার কোন কথাই বলিতে হইবে না,—আমি প্রাণপণ যত্নেই দেখিতেছি। দেখুন, এই ৮৲ টাকা বিজিট দিয়া বাড়ুয্যেরা

আমাকে খিদিরপুর লইয়া যাইতেছিল; পথে শুনিলাম, আপনাদের বাড়ীতে কি দরকার আছে, অমনি ফিরিলাম।

মাতা। বাছা, তোমার ধার আমি শুধিতে পারিব না—তুমি আমার কমলকে ভাল ক'রে দাও। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—কমল যে সারাদিনই বৈ পড়ে, এতে কি কোন দোষ নাই? আমি বলি কি—ঐ ২৪ ঘণ্টা লেখাপড়া ক'রেই বাছার আমার মাথা ধরে।

ম। (ঈষৎ ভাবিয়া) পুস্তক পাঠ দোষ বৈকি?—কোনও পরিশ্রমের কাজ এখন ওঁর পক্ষে খারাপ।

মাতা। আমিও ত তাই বলি—এইমাত্র তার মাথা ধরেচে,—আর এখনি একখানা বৈ পড়ছিলো—

ম। না, না,—সকল রকম পুস্তক পাঠই যে দূষনীয়, তাহা নহে। কোন কোন গ্রন্থ আছে, তাহা পাঠ করিলে, মস্তিষ্ক শীতল হয়। আমি আজ তাঁহার হাত দেখিয়া, বাছিয়া বাছিয়া, শীতল পুস্তকই ব্যবস্থা করিয়া দিব।

মাতা। তবে কমল আমার ঠিক কথাই বলেছিলো—

ম। শুধু পুস্তক পাঠ নহে, সৎসঙ্গীতেরও আবশ্যক। বড় হারমোনিয়মটা সারান হয়েছে নয়?

মাতা। হাঁ, হয়েছে। বাছা,—কমল আমার কদিনে আরাম হবে?

ম। মা, দেখুন,—রোগ ত একটা নয়। শুধু শিরঃপীড়া হলে, তিন দিনে আরাম হতো, মধ্যে মধ্যে উনি যে মূর্চ্ছা যান, ঐটাই ত দোষের কথা।

মাতা। তবে কি কমল আরাম হবে না?

জননীর চোখ ছল ছল্ করিতে লাগিল।

ম। আরাম হবে বৈকি? তবে দুই দিন অগ্রপশ্চাৎ। তিন মাস আন্দাজ চিকিৎসা করিতে হইবে।

মাতা। (মহেন্দ্র বাবুর হাতে ধরিয়া) বাছা তুমি আমার পেটের ছেলের মত; তোমার হাতে ধরে বলচি, কমলকে শীঘ্র আরাম করে দাও।

ম। মা, আপনার কোন চিন্তা নাই।

এই কথা বলিয়াই ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বেগে কমলিনীর কক্ষাভিমুখে ধাবিত হইলেন। মাতাও ডাক্তার বাবুর কিছু জলখাবারের উদ্যোগে গেলেন।

মহেন্দ্র বাবু গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেই পঞ্চদশবর্ষীয় বালক বিপিনচন্দ্র হারমোনিয়মে আলাপ আরম্ভ করিয়াছেন। আর কমলিনী সোফায় সেই ভাবে শায়িত হইয়া, একটী ফুটন্ত মল্লিকার আঘ্রাণ লইতেছেন।

বাঙ্গালায় ইংরেজের শুভাগমনের পর হইতেই উন্নতির আরম্ভ। এখন 'অতি-শিক্ষিত' বাঙ্গালীর বাড়ীর ঝীটী পর্য্যন্ত গীত বাদ্যানুরাগিণী। একবার একজন নব্য বাবু ভারতের উন্নতিকল্পে, বলিয়াছেন, "আমার সাত বৎসরের বালিকাটী উত্তম পিয়ানো বাজাইতে শিখিয়াছে। নাচ-বিদ্যাও অল্প অল্প শিখিতেছে।" এই কথা শুনিয়া অন্য একজন ভারতভক্ত ভাবুক ভ্রাতা বলিলেন, "তবেই দেখিতেছি ভারতমাতার উদ্ধার আর সুদূর নয়!" এমত স্থলে, বিপিনচন্দ্র যে হারমোনিয়ম বাজাইতে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম হইবেন তৎপক্ষে কোনও সন্দেহ নাই।

মহেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসিলেন, "ভগিনি! তুমি কেমন আছ?"

ক। আমি আমার শরীরের অবস্থা কিছুই বুঝিতে সক্ষম নহি। মাথা বোঁ বোঁ ঘুরিতেছে। কখন যেন আমি ঊর্দ্ধে গগনমার্গে উঠিতেছি; কখন যেন নিম্নে পাতালে নামিতেছি, কখন বা পাশাপাশি গোপ্তা চেপ্তা খাইতেছি।

ম। অদ্য মহৎ ঔষধ ব্যবস্থা করিব—

ক। আমার সুচিকিৎসার জন্য আপনার ত তাদৃশ মন নাই। আমার প্রতি আপনার মন থাকিলে কি আমার এ দশা ঘটে? আমি আর আপনার ঔষধ খাইব না।

বিপিন একমনে হারমোনিয়মই বাজাইতে লাগিলেন।

ম। কেন, কেন, কি হয়েছে?

ক। থাক্‌, থাক্‌,—

ম। ভাই বিপিন! তোমাকে একটী বিশেষ কর্ম্ম করিতে হইবে। একটা প্রিস্ক্রিপ্‌ষণ লিখিয়া দিতেছি, তুমি তাহা স্বয়ং লইয়া আমার ডিস্‌পেন্সরীতে যাও। কম্পাউণ্ডারকে বলিবে, এ ঔষধ সেখানে না পাওয়া গেলে, সে যেন বাথগেটের বাড়ী থেকে এনে দেয়।

সংসার-রস-অনভিজ্ঞ, বালক বিপিনচন্দ্র বিজ্ঞ ডাক্তার বাবুর আদেশমত, প্রিস্ক্রিপ্‌ষণ লইয়া ঔষধালয়ে চলিলেন।

কমলিনী তখন চম্পক-অঙ্গুলি-দ্বারা বেলফুলের একটী ছোট তোড়া ঘুরাইয়া, ঈষৎ মুচ্‌কি হাসিয়া ডাক্তার বাবুকে বলিলেন, "আপনি যতই বলুন, আমিত আর আপনার ঔষধ খাব না,—তবে বিপিনকে কেন আর কষ্ট দেন!—ডাকুন বিপিনকে!"

ম। প্রকৃতই বলিতেছি, ঔষধ ব্যতীত তোমার এ রোগ আরাম হইবে না?—তা, বোধ হয়, কোন অন্য ভাল ডাক্তার আছেন! কেন— আমার কি ঔষধ বড়ই খারাপ লাগে?

ক। ছি! ছি! ছি! ওকথা মুখেও আনিবেন না। ইহজীবনে যদি কখন ঔষধ খাইতে হয়, তবে সে আপনার। কিন্তু ঔষধ আর খাইব না,— আমিত মরিতে বসিয়াছি।

ম। কেন, কেন,—ব্যাপার কি বল দেখি? হঠাৎ এ ভাব কেন?

ক। আমি নিতান্ত দুঃখিনী,—সংসারে আপনা ব্যতীত কাহাকেও কখন মনের কথা বলি নাই—কিন্তু আজ আর নয়! সেই বিভাবিকাময় দুর্দ্দিন আমার নিকটে উপস্থিত।

ম। ভগিনি! তুমি আমাকে বড় বিপদে ফেলিলে!—আমি করি কি?—যাই কোথা?—আমি কি আজ এতই অপরাধী যে, সে কথাটী শুনিতে পাইব না? কমলিনি! ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও যে, তোমার মৃত্যুতে আমারও মৃত্যু—

ক। ছি! ছি! আপনি বলেন কি?—আমি মরিলে, পৃথিবীর ভার কমিবে মাত্র,—কিন্তু আপনার কোন অমঙ্গল ঘটিলে, এ ধরাধাম এক অত্যুজ্জ্বল রত্ন হারাইবে!

উভয়ে চারি মিনিটকাল নীরব! শেষে কমলিনী বরফ ভাঙ্গিয়া,

বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আপনার অগোচর আমার কিছুই নাই। আপনি সর্ব্বজ্ঞ। কিন্তু অদ্য আমার নিকট আপনাকে এক সত্য প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইবে—"

ম। বড়ই দুঃখিত হইলাম। তোমার নিকট আবার সত্য কি? প্রতিজ্ঞা কি?—তুমি যে আমার নিকট স্বয়ং সত্য, স্বয়ং প্রতিজ্ঞা, স্বয়ং ঈশ্বর—তাকি তুমি জান না?—

ক। আজ সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী হইলেও এত সুখী হইতাম না!—

ম। যাক্ ওকথা!—এখন সেই গোপনীয় কথা বল।

ক। আপনার নিকট নিবেদন এই; পৃথিবীর মধ্যে কাহাকেও এ কথা বলিবেন না। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, বামন নপুংসক, পরমহংস পরমহংসী, ঊর্দ্ধবাহু, ঊর্দ্ধরেতা,—কোন মানবের নিকট এ নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিবেন না। অধিক কি, জলে স্থলে, অন্তরীক্ষে যত প্রকার জীব আছে,—ভূচর, খেচর, জলচর, উভচর এ ধরাধামে যত রকম প্রাণী বাস করে,—তাহাদের মধ্যে কাহারও নিকট এই ভয়াবহ কথা ব্যক্ত করিবেন না—আমার ইহাই নিবেদন।

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "যদি আমার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আমার পরমাত্মাকেও একথা জানিতে দিতাম না।"

কমলিনী। সে কথা আপনাকে কাগজে লিখিয়া দেখাইব—কাণে কাণে বলিলে,—পাছে অন্য কেহ শুনিয়া ফেলে,—ইহাই আমার ভাবনা।

ম। তাহাই হউক।

কমলিনী, সেই গূঢ় কথা কাগজে লিখিয়া মহেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া, তৎক্ষণাৎ সে কাগজ ছিঁড়িয়া পুড়াইয়া ফেলিলেন।

মহেন্দ্র বাবু প্রথমত, ঈষৎ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। শেষে বলিলেন,—"কমলিনি! তাহাতে তোমার কোনও ভয় নাই;—ইহা আমার পক্ষে ত অতি সামান্য কথা!—আশঙ্কা দূর কর,—মনকে প্রফুল্ল কর—"

ক। আপনি সাহস দিলেই আমি প্রাণ পাই! আপনি অভয় দিলেই আমার মন প্রফুল্ল হয়!

ম। শিশায় সে ঔষধটা আছে কি?—একটু খেয়ে মনটাকে একবার ঠাণ্ডা কর না?

ক। না, আজ আর থাক্—

ম। একটু খেলেই শরীর পবিত্র নির্ম্মল হবে। সর্ব্বরোগ দূরে পলাইবে। হৃদয় তখন প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় হেলিতে দুলিতে থাকিবে।

ক। আচ্ছা, তবে দিন—

ঔষধ সেবনান্তে, কমলিনীর কমনীয় মুখকান্তি অধিকতর শোভা প্রাপ্ত হইল। উজ্জ্বল চক্ষু দুখানি অধিকতর জ্বলিতে লাগিল। গোলাপী গণ্ডস্থল দুটী যেন বিকশিত গোলাপপুষ্পবং প্রতীয়মান হইল।

তখন মহেন্দ্র বাবু বলিলেন "মাথাধরার প্রধান ঔষধ কিন্তু সঙ্গীত!—সঙ্গীতে মানসিক ব্যাধি দূর করে—"

ক। আমি ত সঙ্গীতের সদাই প্রিয়তমা সখী। আপনি হারমোনিয়াম ধরুন—আমি ঈশ্বর গান আরম্ভ করি।—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল পোস্তা।

কে তুমি কাছে বসে থাক সর্ব্বদা আমার?
স্বভাব প্রকৃতি রীতি, মিষ্ট অতি, কি নাম বল তোমার?
প্রতি দিন এত ক'রে, কেন ভাল বাস মোরে,
দয়াতে পূর্ণ হয়ে, কর কেবল উপকার।
রূপে গুণে অনুপম দেখি নাই কোথা এমন
মধুর আকর্ষণে, প্রাণ টানে, তোমার পানে বারেবার?
নাই আলাপ, নাই পরিচয়, দেখিলে মন মোহিত হয়,
চিনেও চিনিতে নারি, একি দেখি চমৎকার।
সম্বন্ধে কে হও তুমি, (তাইরে নারে নাইরে না)
যে হও সে হও তুমি, তুমি আমার আমি তোমার।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল পোস্তা।

গভীর অতলস্পর্শ তোমার প্রেমসাগরে;
ডুবিলে একবার কেহ আর কি উঠিতে পারে?

প্রেমিক মহাজন যারা, না পেয়ে কূলকিনারা,
হইল চির-মগন ফিরিল না আর সংসারে।
কত সুখ প্রলোভন, প্রেম শান্তি মহাধন,
অনন্ত অগণন রেখেছ সঞ্চিত করে।
নিত্য সুখ শান্তি দিয়ে, আনন্দে ভুলাইয়ে,
রেখেছ তাদের চিত্ত একেবারে মুগ্ধ করে॥

গান শেষ হইল না। আশা পূর্ণ হইল না। বিপিনও মহৌষধ লইয়া ফিরিল না। হঠাৎ তাল ভঙ্গ হইল। মহামজলিস ভঙ্গ হইল। সেই হল্ হইতে শব্দ উঠিল "আসুন, আসুন, বসুন, বসুন,।" কে যেন কাহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছে। আর সেই হ'লে দাঁড়াইয়া কোন ভক্ত ব্যক্তি গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন, "হরি রক্ষা কর, হরিবোল! হরি।" কমলিনী তীক্ষ্ণবাণ-বিদ্ধ হরিণ-শিশুর ন্যায় অসাড় হইয়া পড়িলেন; কেবল অধরপল্লব, নয়ন এবং ভ্রূ ঈষৎ স্পন্দিত হইতে লাগিল। আর, কর্ণ-বিবর উন্মুক্ত হইল,—মনে হইল যেন আত্মা কর্ণ দিয়া বাহির হইয়া সেই দিক্-পানে ছুটিল। শেষে কমলিনী ভয়চকিতনেত্রে, কম্পিতস্বরে মহেন্দ্র বাবুকে বলিলেন, "ঐ, আসিয়াছে,—ঐ, কথা কহিতেছে! আপনি অদ্যই শীঘ্র উকীল বাবুর বাসায় যান। পরামর্শ মতে, কল্য প্রাতে, অথবা বৈকালে, ডাক্তার সাহেবকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন।"

এইরূপে ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় ছয়টার পর হইতে ৭টা পর্য্যন্ত, কিছু কম একঘণ্টা কাল, কমলিনীর সুচিকিৎসা করিয়া গৃহ হইতে, দ্রুতপদবিক্ষেপে, অন্তদ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন।

কমলিনী তখন মাথায় একটা লাল কাপড় বাঁধিয়া বিকটরবে "আঃ, উঃ," করিতে করিতে সেই কক্ষস্থ খাটে পূর্ণমাত্রায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হায়! হায়! হায়!—আবার সেই ডোক্‌রা বামুন, আর নগ্‌দা-মুটে! কি আস্পর্দ্ধা! সেই বামুনটো এসে, একেবারে শুধু পায়ে, সেই হ'লে দাঁড়িয়েছে! চটীজুতা যোড়াটী বাহিরে খুলে রেখে এসেছে!—কি আহাম্মক! কি অসভ্য!

ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়াই বিপিনকে সম্মুখে দেখিয়া, প্রথমে জিজ্ঞাসিলেন;—"কর্ত্তাবাবু ভাল আছেন; মা ভাল আছেন?"

হলে আর কেহই নাই—কেবল একা বিপিন। বিপিন প্রথমে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। সুতরাং সে, সহসা ভাল মন্দ কিছুই উত্তর দিল না. ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, "বিপিন বাবু, চিনিতে পারিতেছ না? তোমরা তখন ছেলে মানুষ। চার বৎসর দেখ নাই, ভুলে যাবে বৈকি ভায়া?"

বি। "চিনেছি, চিনেছি,—আপনি রায়-মহাশয়? –(উচ্চরবে) ও-মা রায় মোশাই এসেছেন, জামাইবাবু এসেছেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে বিপিন অন্দরাভিমুখে দৌড়িল। ডেপুটী বাবুর অন্দর সদর প্রায় একই; সেই হলটী সদর, আর তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ কুঠারিগুলি অন্দর। সুতরাং সদর অন্দরে কিছু মাখামাখিভাব।

ভৃত্যগণ তখন "আসুন আসুন, বসুন" বলিয়া রায় মহাশয়কে সম্বোধন করিল। অন্দর হইতে বালক বালিকাগণ দৌড়িয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিল। জননী কপাটের অন্তরালে থাকিয়া জামাতা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

রায় মহাশয় তখনও দাঁড়াইয়া। মুখে বলিতেছেন, "হরিবোল, দীনবন্ধু, হরি রক্ষা কর।"

বিপিন ফিরিয়া আসিয়া, তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া পুনরায় বসিতে বলিল। বাস্তবিক রায় মহাশয় একটু বিপদে পড়িয়াছেন। মেজেতে বসেন, কি চেয়ারের উপরে বসেন,—ইহাই ঠিক করিতে পারিলেন না। চেয়ারে বসা তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় নহে। সেই হলের মেজেতেও

বেশ উত্তম বিছানা—কার্পেট পাতা। সুতরাং কোথায় বসি,—এই ভাবনা-তেই তাঁহার চিত্ত ঈষৎ দোলায়মান হইতেছিল। অবশেষে, সকলকেই চেয়ারে উপবিষ্ট দেখিয়া, তিনি অগত্যা চেয়ারেই বসিলেন।

জামাতা। বিপিন বাবু, মোটটী ঘরে রেখে আসিতে বল ত?—একটু ভাল জায়গায় যেন রাখা হয়,—কারও যেন পা না ঠেকে;—উহাতে চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ আছে।—হরি রক্ষা কর!

মুটে। ঠাকুর পয়্সা দেও না,—কেৎনা ঘড়ি হাম্ খাড়া রহেঙ্গে।

দ্বারবান্। চুপ্ রও, গোল মৎ করো—হিঁয়াসে নীচু যাও—

রায়। পয়সা দিচ্চি বাপু, একটু দেরী হয়েছে বটে,—পথ ভুলে অন্য দিকে যেয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু সে দোষ ত তোমারই।

এই বলিয়া তিনি ট্যাঁক হইতে ছয়টী পয়সা খুলিয়া দ্বারবানের হাতে দিলেন। মুটে ছয়টী পয়সা পাইয়া, রাগে গন্ গন্ করিয়া এবং বিড় বিড় করিয়া, দ্বারবানের হাতে ফেলিয়া দিল। দ্বারবান, ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তাহার গলাধাক্কা দিবার উপক্রম করিল। রায় মহাশয় ব্যাপার দেখিয়া, শশ-ব্যস্তে উঠিয়া গিয়া বলিলেন,—"মের না বাপু, মের না বাপু,—ও ব্যক্তি ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তোলে কি?—পেটের দায়ে মুটেগিরি কচ্চে। এই নও, আর দুটী পয়সা,—উহাকে দিয়া বিদায় কর।

মুটে হিন্দুস্থানী-ব্রাহ্মণ। গলায় মলিন পৈতা। উত্তরপশ্চিম-অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ-মহোৎসবে সে, একবার প্রফুল্ল হইয়া, সেই শুভসংবাদ দিতে, কলিকাতা আসিয়াছিল। আজ প্রায় পাঁচ বৎসর সে ব্যক্তি কলিকাতায় মুটেগিরিরূপ মহাকাজে ব্যাপৃত আছে। এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে কেহই ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মান করে নাই। মুটে বড় খুশী হইল। বলিল—

"ঠাকুরজী, হ্যাম ছয় পয়সা লেঙ্গে, আওর যাস্তি পয়সা নেহি মাঙ্গতা।" এই বলিয়া মুটে চলিয়া গেল।

মুটে-ঘটিত গোলমালে, ডেপুটী বাবুর খাস্‌খানসামা আসিয়া উপস্থিত হইল। খাস্‌খানসামার গায়ে বুকে-বোতাম-আঁটা আঙরাখা। পরি-ধান ফুলপেড়ে মিহি কাপড়। পায়ে স্লীপার চটি। মাথায় ছেয়া-সাঁথি।

চোখ দুটা ঈষৎ লাল। খানসামা-বাবু আসিয়া, জামাই বাবু ওরফে রায় মহাশয়ের কাছে গিয়া, গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি এদিকে আসুন, বসুন,—মুটের সঙ্গে আপনার কথা ক'বার দরকার কি?"

রায়। কি, কপিল!—ভাল আছ?

খান্‌সামার নাম কপিলচন্দ্র দাস। জাতিতে সংগোপ।—

কপিল। আজ্ঞে, আপনার ছিচরণ আশীর্ব্বাদে ভাল আছি। একটু পায়ের ধূলা দিন্।

এই বলিয়া ঢুলঢুলায়িত আঁখি কপিল খানসামা, রায় মহাশয়ের পদতলে, গড়াইয়া পড়িল। এবং পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

প্রণামকাণ্ড শেষ হইল। রায় মহাশয় আবার চেয়ারে বসিলেন। অপর একজন ভৃত্য কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া, তাঁহার হাতে হুঁকা দিতে গেল।

রায়। এ হুঁকায়ত আমি তামাক খাই না, আমার হুঁকা মোটে বাঁধা আছে। সেইটা লইয়া আইস।

ভৃত্য হুঁকান্বেষণে গেল।

রায়। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলো। সন্ধ্যা আহ্নিক কর্ত্তে হবে, একটু গঙ্গাজল ও কোশাকুশী চাই।

কপিল। গঙ্গাজল ত নাই। বেশ রেফাইন করা ভাল কলের জল আছে। খুব ভাল জল, তাতে খুব ভাল সন্ধ্যা আহ্নিক হবে!

রায়। পাগল! পাগল! তাও কি কখনো হয়? স্বর্গীয় সুধার সঙ্গে কখন কি হাড়ীবাড়ীর চিটাগুড়ের তুলনা হয়? সেই পবিত্র পাপক্ষয়কর জাহ্নবী-সলিলের সহিত তুলনা কার?

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃপুণ্যবন্তং
সতরতি নিজ পুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্ত্বং।
যদিচ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনম্মাং
তদপি তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বম্মহত্ত্বং॥

কপিল কিছুই বুঝিল না, কেবল মনে মনে হাসিল। প্রকাশ্যে বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে, একটু পরে গঙ্গাজল আনিয়ে দিব। আপা-

তত আপনি একটু জলটল খান, রেলগাড়ীতে আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে, তেষ্টাও পেয়েছে,—

রায় মহাশয় এইবার প্রাণ খুলিয়া হো হো হাসিয়া উঠিলেন তাঁহার হাসিটা কিছু উচ্চ অঙ্গের ছিল। তিনি অন্তরের হাসি হাসিলে, তাহা অনেক দূর ব্যাপ্ত হইত। সুতরাং হাসির রবে অনেকে চমকিয়া উঠিল। ছোট ছোট ছেলেপিলে,—যাহারা রায় মহাশয়কে দেখিতে আসিয়াছিল,—তাহারা ভয়ে পলাইল। কপিল খানসামা; তাঁহার কাছ হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইল, এবং অপরকে, জামাই বাবুর নিকটে আসিতে ইঙ্গিতে নিষেধ করিল।

কপাটের অন্তরালে দণ্ডায়মানা বৃদ্ধা জননী কপাট ঠক্ ঠক্ করিতে লাগিলেন। শব্দ শুনিয়া কপিল বিদ্যুৎবেগে, গৃহিণীর নিকট গমন করিল।

মাতা। এবার জামাইকে কেমন বুঝ্‌চ?

কপিল। গতিক বড় মন্দ! সে ঝোঁক একটুকুও যায় নাই, বরং ঝোঁক বেড়েছে। তাঁর সেই দালান-ফাটা হাসি শুনে, আর সেই কট্‌কট্ চাউনি দেখে অবধি আমার গা ঠাই ঠাই কাঁপচে। মাঠাকুরুণ! বল্‌বো কি, জামাই বাবু বদ্ধ পাগল হয়েছেন।

মাতা। সবই আমার অদৃষ্ট! বাছা কপিল, তুমি এখন গিয়ে দেখ শোন, সেবা-শুশ্রূষা কর, তা হইলেই ঝোঁক কমে যাবে।

কপিল। মা, চেষ্টার কিছুই ক্রুটী করি নাই। তামাক সেজে নিয়ে গেলাম, তিনি বল্লেন, এ হুঁকায় খাবোনা; জলখেতে সাধ্‌লাম,—একেবারে একটা বিতিকিচ্ছি হেসে, তিনি আমায় যেন মাত্তে এলেন। শেয়ালদর ষ্টেসন থেকে, যে মুটে সঙ্গে এসেছিল, তার উপর ভয়ানক খুঁকে উঠেছিলেন; আমরা সব এসে না পড়লে, তাকে মেরেই ফেল্‌তেন।

মাতা। গাড়ীতে এসে হঠাৎ মাথা গরম হয়ে থাকবে। একটু ঠাণ্ডা টাণ্ডা হলেই ভাল হবে।

কপিল প্রস্থান করিলে, জননীর চোখ দিয়া দরদরিত ধারে জল

পড়িতে লাগিল। মাতা ভাবিতে লাগিলেন;—"আমার বড় সাধের একটী মেয়ে,—বড় আদরে মানুষ করেছি, বাছার শুখান মুখটী দেখিলে বুক ফেটে যায়। তাতে জামায়ের ঐ অবস্থা হলো—" জননীর নয়ন-জলে সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হইল।

কপিল, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, জামাতা, আপন ছোট থেলে হুঁকায় তামাক খাইতেছেন। ভাবিল, এমন সুন্দর, সুদীর্ঘ, রূপাবাঁধান হুঁকা ফেলিয়া, ঐ ক্ষুদ্রকায় হুঁকার উপর ইহাঁর এত ভক্তি কেন? অথবা ছিটগ্রস্ত ব্যক্তির স্বভাবই বুঝি এইরূপ?

রায়। হরিবোল্, হরি রক্ষা কর,—ওহে কপিল,—

কপিল খুব চালাক পুরুষ খুব সায়েস্তা খানসামা। "ওহে কপিল" —এই কথাটী তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই, সে অমনি নিকট যাইয়া, প্রায় তাঁহার গায়ে গা দিয়া, বলিয়া উঠিল,—

"কি আজ্ঞে কচ্চেন হুজুর, বলুন"—

রায়। গঙ্গাজলের কতদূর?

কপিল আজ্ঞে, অনেকক্ষণ লোক গিয়েছে, এলো বলে।

রায়। সন্ধ্যার সময় হয়েচে, হরি রক্ষা কর।—তোমাদের পাঁজিখানা একবার, বিপিন! দাও দেখি?

দিদির ঔষধ আনার পর, বিপিন এক মনে আবার সেই একটাই কসিতেছিল; হঠাৎ রায় মহাশয়ের কথা শুনিতে পাইল না। জামাতা আবার বলিলেন,—"ও—বিপিন বাবু, শোন হে,—তোমাদের পাঁজিখানা কৈ?"

বিপিন। কি পাঁজি?

রায়। কি পাঁজি, আবার কি? এই যাতে তারিখ, তিথি, নক্ষত্র আছে,—শ্রীরামপুরে, বা গুপ্তপ্রেশ, যাহো'ক হলেই হ'বে।

বিপিন। কৈ, আমাদেরত গুপ্তপ্রেশ আলম্যানাক্ নাই, থাকার্স-ডিরেক্টরী আছে।

রায়। ঘরে পাঁজি নাই কি হে?

কপিল খানসামা ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"আছে, আছে. দিদি বাবুর

ঘরে পাঁজি আছে,—দেওয়ালে টাঙ্গান আছে। তিনি রোজ তারিখ দেখেন।”

রায়। পাঁজি আবার দেওয়ালে টাঙ্গান কিরূপ ?

বিপিন। ও হো, সে যে ইংলিস্‌ম্যান্‌স্‌ শীট্‌-অ্যাল্‌ম্যানাক্‌—তাতে অনেক কথা আছে বটে!

রায়। আচ্ছা, সে পাঁজিতে যদি সব কথা থাকে, তবে তাই একবার না হয় নিয়ে এস!

কপিল। সে পাঁজি নিয়ে আস্‌বার যো নাই,—একবারে গজাল-আঁটা, দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা,—দেওয়াল ভাঙ্গবে, তবু সে পাঁজি খসবে না—এমনি দিদি বাবুর বন্দোবস্ত! আচ্ছা, আপনি না হয়, সে ঘরে চলুন, গিয়ে দেখে আস্‌বেন! আসুন আমার সঙ্গে।—

রায়। এমন ত কথা কোথাও শুনি নাই, পাঁজির কাছে স্বয়ং যেতে হবে, পাঁজি নিকটে আস্‌বেন না।

বিপিন। সে যে সব ইংরেজীতে লেখা, উনি সে পাঁজি দেখেই বা কি কর্‌বেন ?

কপিল। দিদি বাবু না হয়, ইংরেজীটা ওঁকে বুঝিয়ে দেবেন!

রায়। থাক্‌ থাক্‌, পাঁজি দেখ্‌বার তত দরকার নাই,—এখন সন্ধ্যার উদ্যোগ করে দাও,—গঙ্গাজল এলো কি? কোশাকুশী ধৌত করে রাখ।

কপিল, কোশাকুশী কাহাকে বলে প্রকৃতই জানে না। ভাবিল, পাগলটা এলোমেলো বকিতেছে। আন্দাজী বলিল, বাড়ীর ভিতর সে সব ধুয়েটুয়ে রাখা হচ্চে—

রায়। না হে, দেখ যেয়ে—হয়েচে কি না? শীঘ্র ঠিক ক’রে রাখতে বলো। সময় বুঝি উত্তীর্ণ হলো।

এইবার কপিল বিরক্ত হইল। মনে মনে বলিল, “আঃ বুড়ো বামুন জ্বালাতন করিয়া মারিল। পাগলের কথা শুনে যাবো কোথা?” অন্দরাভিমুখে খানিক যেয়ে, কপিল থামের আড়ালে খানিক বসিয়া রহিল। উঠিয়া আসিয়া বলিল,—

"সে সব ঠিক হয়েছে; মা ঠাকুরুণ কোশা ধুয়েছেন, দিদি বাবু কুশি ধুয়ে রেখেছেন।"

ব্রাহ্মণ তখন যেন একটু আশ্বস্ত হইয়া, গঙ্গাজল আগমন প্রতীক্ষায়, ধীরে ধীরে একমনে অথচ সতেজে আপন থেলো হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের অযত্নে, কল্কের অগ্নি, অভিমানে মলিন হইয়াছেন; সুতরাং তিনি আর, ধূম দিতে রাজি নহেন। 'গোড়ায় কাটিয়া আগায় জল' দিলে যে কোন ফল হয় না, তাহা বিদ্যাসুন্দরে একরূপ প্রমাণ হইয়াছে। অতএব সেই নজীরের বলে, এখানেও মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবার যোগ্য হয় হয় হইয়াছে,—এমন সময় কপিল খানসামা বিপদভঞ্জন বারিষ্টাররূপে আসরে অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন,—"কল্কেটা আমাকে দিন, ফুঁ দিয়ে দি, আগুন বুঝি ধরে নাই।" কপিল এই বলিয়া হুকা হইতে কল্কে খুলিয়া লইয়া ফুঁ দিবার জন্য, থামের আড়ালে গেল। তথায় সে, ফুঁ দিল, কি মুখ-দিল, তাহা অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারেন কি না সন্দেহ।

এদিকে সিঁড়িতে আবার ডসনের বাড়ীর জুতার দুপ দুপ শব্দ শ্রুত হইল। ওদিকে ভৃত্যের মুখের আদরে কল্কের-অগ্নিও হাসিতে লাগিল। কপিল তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণকে কল্কে দিতে আসিল। হুঁকার উপরে কল্কের অধিষ্ঠান হইলে, ব্রাহ্মণ যেমন হুঁকায় মুখটী দিয়াছেন, অমনি সেই জুতার শব্দ মানুষে পরিণত হইয়া, সেই জামাতা—সেই হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্মুখে দেখা দিল।

বিপিনচন্দ্র অমনি দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "বড়দাদা মা আপনাকে আজ ডেকেচেন—"

নিতাই শশব্যস্তে বড়দাদার হাতের ছড়ি এবং হ্যাট লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। এবং যেখানে তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখানে একখানা চৌকী আনিয়া কোঁচার দ্বারা তাহা ঝাড়িয়া দিল। বড়দাদা তথাচ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রবীণ ব্রাহ্মণ, সে মূর্ত্তি দেখিয়াই অবাক! বড় সাধে অধরপ্রান্তে হুঁকা লইয়াছিলেন, কিন্তু জানি না, হঠাৎ সে সাধে কে বাদ সাধিল! ব্রাহ্মণ সে বড়দাদা-মূর্ত্তি অবলোকন করিবামাত্র, অমনি অতি

ব্যস্ত হইয়া, সেই চুম্বিত-অধর-হুকাকে দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে শূন্যে দূরে ধরিয়া রহিলেন। এই কার্য্য সমাধান্তে সেই বড়দাদা-জীবের আপাদমস্তক তিনি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথমত দেখিলেন, মাথার সম্মুখভাগের চুলে চেরা সিঁথি,—পেটোপাড়া; চক্ষুদ্বয় লাল বর্ণ,—ছল্ ছল্ ভাবে ভরা; গাল দু-খানি কতকটা কালো-গোলাপী,—যেন ছানাবড়ার পাকে ঢালা। কিন্তু সে মূর্ত্তির মুখের দিকে, তাঁহার দৃষ্টি অধিকক্ষণ রহিল না,—নিম্ন অবয়বে নয়ন নিপতিত হইল। সে নয়ন আর তিনি ফিরাইতে পারিলেন না—সেই কোমর অবধি বিলম্বিত কালোকোট; সেই আঁটাসাঁটা, পদদ্বয়ের সহিত বিষম-নিবদ্ধ পেণ্ট্লান, সেই হাঁটু পর্য্যন্ত উত্থিত বিলাতী বিনামা; সেই ত্রিভঙ্গ, বঙ্কিম অঙ্গভঙ্গি—দেখিয়া ব্রাহ্মণের মন মজিয়া গেল। হাতের হুঁকা হাতে রহিল। ব্রাহ্মণের সেই সুতীক্ষ্ণ নয়নযুগল কেবল সেই মহামূর্ত্তিকে যেন গ্রাস করিল।

সেই অবয়বের নাম "ডি এন চাটর্জ্জি এস্কোয়ার, বারিষ্টার-অ্যাট-ল।" আজ দুই বৎসর হইল, চাটর্জি সাহেব, বিলাত হইতে আসিয়া, ভারতবক্ষে শুভপদ অর্পণ করিয়াছেন।

চাটর্জ্জি সাহেব শুধু বারিষ্টার নহেন,—বিশেষ কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচিত। তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রে প্রায় সমান অধিকার। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, জ্যোতিষ, ধর্ম্মগ্রন্থ, এবং সাহিত্য—ইংরেজীতে এ সমস্তই তাঁহার কণ্ঠস্থ। জাহাজ থেকে নামিয়াই তিনি বাঙ্গালার পোষাকের উপর প্রথম বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে প্রমাণীকৃত হয়, বাঙ্গালার পক্ষে হ্যাটটী পরম উপযোগী। এদেশে সূর্য্যের উত্তাপ বড়ই ভয়ঙ্কর। হ্যাট মাথায় দিলে, মুখে আর রোদ লাগিবে না। বিশেষত চাসা-লোকের, বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে হ্যাট মাথায় দিয়া লাঙ্গল ধরা, একান্ত উচিত। এই বক্তৃতায় তাঁহার নাম-পড়িয়া যায়। চাটর্জি, দ্বিতীয় বক্তৃতায় বিজ্ঞান বলে প্রমাণ করিবেন,—পেঁয়াজ, মুর্গী, মহামাংস—এই তিনের একত্র রাসায়নিক সংযোগে এক মহাদ্রব্য প্রস্তুত হয়! বাঙ্গালী যদি সেই মহাদ্রব্যের লাড়ু পাকাইয়া দুবেলা জল খায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বাঙ্গালী নিরোগ দেহে দীর্ঘজীবী হয়! তৃতীয় বক্তৃতায় ঠিক হইল যে

তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বানর ছিল। এইরূপে বক্তৃতায়, বাহোবায় কিছুদিন অতিবাহিত হইল। তারপর রাষ্ট্র হইল, তিনি বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিবেন;—কলিকাতা হাইকোর্টটী তাঁহার মতে খারাপ। কেহ কেহ এমনও বলিল যে, তিনি মুনসেফীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। দুষ্ট লোকের কুটিল কথা শুনিবার দরকার নাই; চাটর্জি সাহেব কিন্তু সহজে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

চাটর্জি দেখিতে দিব্য পুরুষ। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ—যাকিয়ার পাঁঠা—কোথাও একটু সাদার বিশ্রী দাগ মাত্র নাই। ঠিক যেন শিবনিবাসের বার্ণিসকরা সেই অনাদি শিবলিঙ্গমূর্ত্তি চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে! অথবা দেবাদিদেব মহাদেবের যে মূর্ত্তি, রঙে বুঝি আজ চাটর্জির নিকট পরাজিত হইল। তদুপরি আবার বনাতের কালোকোট,—ওঃ! কি বাহার!! নবমেঘ যেন নবমেঘকে আলিঙ্গন করিয়াছে! পৃথিবী অন্ধকারময় হইল—দিবসে প্রদীপ জ্বালা বুঝিবা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে! না,—তা নয়! আবার ঐ দেখ,—মাঝে মাঝে কিবা রমণীয়, কমনীয় দন্ত বিকাশন! যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী! অথবা যেন শারদীয়া জ্যোৎস্না মেঘের অন্তরালে থাকিয়া মাঝে মাঝে উঁকি মারিতেছে!

চাটর্জি সাহেব, বিপিন বাবুর যে কি রকম বড়দাদা তাহা কেহ জানে না,—খুড়তুত, মাসতুত কি পিসতুত, অথবা গ্রাম সম্পর্কে বড়দাদা, তাহা কেহই জানে না। তবে এটা ঠিক,—অনেকেই চাটর্জিকে বড়দাদা বলিয়া সম্মান করেন। আর বিপিনের সেই স্নেহময়ী, সরলতাময়ী জননী চাটর্জিকে, বিলাত যাইবার পূর্ব্ব হইতেই "ছেলে ছেলে" বলিতেন। মাতার ঐ কেমন একটা বদ অভ্যাস,—ছেলে দেখিলেই ছেলে বলা, মেয়ে দেখলেই মেয়ে বলা। কিন্তু "ইল্লৎ যায় ধুলে, স্বভাব যায় মো'লে।" সুতরাং জননীর মৃত্যু পর্য্যন্ত এ দারুণ দোষ থাকিবে! সে যাহা হউক, চাটর্জির বাসা দূরে হইলেও জননী প্রতি সপ্তাহে দুইবার, না হয় একবার, আহারাদির জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিতেন।

চাটর্জি-সাহেব, বাঙ্গালা কথা একরকম ভুলিয়া গিয়াছেন! বুঝিতে

পারুক, আর না পারুক—প্রায় পনের আনা লোকের সঙ্গে তিনি ইংরেজীতে মনের ভাব বদল করেন। যেখানে নিতান্ত উপায় নাই—সেখানে তাহার ভাষা হিন্দী। তবে কদাচিৎ দু-একস্থলে ব্যতিক্রম আছে;—তখন ভাষা; বাকা-বাঁকা বাঙ্গালা। যথা, কমলিনীর মাতা, আহারের সময় চাটর্জ্জিকে যদি বলেন, "বাছা; আর একটু খাও।" চাটর্জ্জি, বাঙ্গালায় উত্তর দেন; "হামি আর খাইতে পারবে না।"

চাটর্জ্জি সেই প্রকাণ্ড হলে দাঁড়াইয়া, চারিদিক কটমট্ চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া, বিপিনের দিকে মুখ ফিরাইয়া, কথা আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, সেকথা ইংরেজীতে।

এইবার বড় বিষম সমস্যা আসিল। এ গ্রন্থ বাঙ্গলা, বিষয় বাঙ্গালা, গ্রন্থকার বাঙ্গালী, পাঠক বাঙ্গালী, সুতরাং কেমন করিয়া এস্থলে রাশি রাশি ইংরেজী কথা তুলিয়া স্থান অপরিষ্কার করিব? অগত্যা তাঁহাদের সেই ইংরেজী-কথা-বার্ত্তার নিম্নে অনুবাদ দিতে হইল। কিন্তু অনুবাদে মূল-ভাষার সৌন্দর্য্য থাকে না—তাই মনে দুঃখ রহিল, ইংরেজী-অভিজ্ঞ পাঠককে চাটর্জ্জির ইংরেজী-ভাষার উপর আদবকায়দা শুনাইতে পারিলাম না।

আর এক কথা বলি। রায় মহাশয় ইংরাজী-অনভিজ্ঞ। চাটর্জ্জির সহিত বিপিনের যে কথাবার্ত্তা হইল, রায় মহাশয় তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলেন না।

চাটর্জ্জি। কে ঐ খালি-পায়ে, উলঙ্গ কুৎসিৎ জীব, বাঁদরের ন্যায় বেদেরার উপর বসিয়া আছে?

বিপিন। আমার ভগিনীর স্বামী (হস্‌ব্যাণ্ড)।

চাটর্জ্জি। সে কি কথা? তুমি কি আমাকে তামাসা করিতেছ? সত্য কথা বল! কোন ভয় নাই!

বিপিন। (হাসিয়া) বড়দিদির ত উনিই স্বামী।

চাটর্জ্জি। হায়! ইহা বড় শোচনীয় সত্য কথা! তাহা কখন হইতে পারে না, হওয়া সম্ভবও নয়, এবং হইবেও না—মিঃ রায় পাগল বলিয়াতে সুবিখ্যাত!

বিপিন। না, না, প্রকৃত পাগল নন,—তবে পাগলের দিকে একটু ঝোঁক আছে।

চাটর্জি। হা স্বর্গ! এই কি তোমার বিচার? যিনি সৌন্দর্য্যের খনি, পবিত্রতার আধার, সন্নীতির সারভাগ, এবং স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ-স্বরূপা,—হা ঈশ্বর!—সেই স্বর্গীয়া রমণীর উপর আপনার এরূপ নিষ্ঠুরতা কেন? হায়! প্রিয়-ভগিনি! হায় কমলিনি! তোমার কিবা বিনয়নম্র, সুন্দর সুমিষ্ট কথা! প্রতিবেশী পুরুষের চক্ষুর নিকট তুমি শুকতারাবৎ সদাই সমুদিত!

বড়দাদার মুখভঙ্গী, অঙ্গচালনা এবং বক্তৃতার তেজ দেখিয়া বিপিনের একটু ভয় হইল বুঝিল, দাদা প্রকৃতস্থ নাই—ভাবের বে-ভাব ঘটিয়াছে। বিপিন তখন অতি বিনীতভাবে বড়দাদাকে বলিল, "দাদা, আমরা হ'লের ওপাশে গিয়া বসিগে চলুন—

চাটর্জি। আচ্ছা; ঐ পাগল পিশাচ একাকী থাকুক—উহার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের উচিত।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, চাটর্জি সাহেব; ভ্রাতা বিপিনের গলা ধরিয়া, কতকটা প্রেমালিঙ্গনের ভাব দেখাইয়া, চলিতে চলিতে; হলের অপর পাশে চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

চাটর্জি পশ্চাৎপদ হইবামাত্র, রায় মহাশয় নাকে কাপড় দিলেন।

ওদিকে চাটর্জি সাহেব, সংগন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে, হলের অপর প্রান্তস্থিত এক সোফায় গিয়া বসিয়া পড়িলেন। বিপিন, অন্যমনস্কবশত, বাঙ্গালায় বলিয়া ফেলিল——"বড়দাদা, শোবেন কি?" বড়দাদা তখন বিরাট বিক্রমে বলিয়া উঠিলেন,—"ছি! ছি! ছি! পুনরায় তুমি সেই অনভ্যের অবজ্ঞ ভাষা ব্যবহার করিতেছ? বল,—কতবার আমাকে তোমার চরিত্র সংশোধন করিতে হইবে? সভ্যজাতির ভাষার সহিত ভ্রাতৃভাব জন্মাইবার সতত চেষ্টা করিবে যদি তুমি জগতে উন্নতি করিতে ইচ্ছা কর, তবে প্রথমত তোমার সেই নাচকুলোদ্ভবা মাতৃভাষা ভুলিয়া যাও। তুমি এখন বালক; তুমি কি তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের পথে চলিয়া, তোমার ভবিষ্যৎ আশা, স্বাস্থ্য এবং কার্য্যকরী-ক্ষমতা নষ্ট

করিবে?—যখনই তুমি সুবিধা পাইবে, তখনই তুমি ইংরেজীতে কথা কহিতে অভ্যাস করিবে!—অধিক আর কি বলিব?—তুমি ইংরেজীতে চিন্তা করিবে, ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখিবে, ইংরেজীতে নিদ্রা যাইবে। এখন হইতে ক্রমান্বয়ে এইরূপ কার্য্য আরম্ভ করিলে; ভবিষ্যতে আর কেহই তোমার কথা শুনিয়া, তোমাকে নিগার বাঙ্গালী বলিয়া ঠিক করিতে পারিবে না।”

দাদার সাক্ষাতে অন্যমনস্কে বাঙ্গালা কথা বলিয়া ফেলিয়া, বিপিন বড়ই অপ্রতিভ হইল; মুখ হেঁট করিয়া রহিল। কিন্তু দাদা তখন স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছেন,—তাঁহার মন-ঘুড়ি কখনও শূন্যে উড়িতেছে, কখনও নীচে পানে নামিতেছে, কখন বা মধ্যপথে খেলিয়া বেড়াইতেছে; সুতরাং তাঁহার বাক্যালাপের বিশ্রাম নাই, মুখ-খোলায় অবিরল খৈ ফুটিতে লাগিল। বিপিন বড়ই বিপদে পড়িল। উঠিবার যো নাই;—আদর করিয়া দাদা, বিপিনের হাত দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়াছেন।

এ দিকে রায় মহাশয়, হুঁকাটী ধরিয়াই রহিলেন। কপিল সেভাব অবলোকন করিয়া বড়ই বিস্মিত হইল। কল্কেতে এত করিয়া ফুঁদিয়া ধরাইয়া দিলাম, আর বামুনটো মুখের কাছে লইয়া গিয়া, হুঁকাটা সরাইয়া ফেলিল। কি আশ্চর্য্য! ব্যাপার কি? অথবা পাগলে সবই সম্ভবে।

হলের দূরপ্রদেশে, চাটর্জ্জি-সাহেব অবস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ কপিলকে বলিলেন—“কপিল, হুঁকাটা রাখো—”

কপিল। কেন মোশাই, কি হলো? আপনি কি তামাক খান্ না?

রায়। না হে, আর খাবোনা,—দরকার নাই। গঙ্গাজল এসেছে কিনা দেখ।

কপিল। (যোড়হাতে) আজ্ঞে, তামাকটা খারাপ কি? বলেন ত, ভাল তামাক আনাই। অধীনের বড় অপরাধ হইয়াছে। আপনি আমার মা বাপ!

এই বলিয়া আরক্তলোচন কপিল সেই গম্ভীর-মূর্ত্তি ব্রাহ্মণের পায়ে ধরিল।

এইবার ব্রাহ্মণ ঈষৎ কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"আঃ, কি করচো? হুঁকাটা আগে রাখোনা।"

এই বলিয়া রায় মহাশয় পা সরাইয়া লইল। কপিল অগত্যা উঠিয়া, হুঁকা লইয়া রাখিয়া দিল।

তখন জামাতা অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিলেন। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে আটটা। তিনি কপিলকে বলিলেন, "তোমাদের বুঝি আজ আর গঙ্গাজল আসিবে না; আচ্ছা, গঙ্গা ত কাছে, আমি ঘাটে গিয়াই সন্ধ্যা করিয়া আসি—"

কপিল। তা কি হয়! আপনি এই এলেন,—জলটল খা'ন, এক গ্লাস বরফ-লেমনেট খান,—এর মধ্যে এত রাত্রে অন্ধকারে গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে যাওয়া কি? গঙ্গা কি কাছে?—এখান থেকে এক ক্রোশের উপর। আপনি গেলে, মা আমাকে বড়ই বক্‌বেন—

রায়। না, না.—আমি শীঘ্র আসচি—

এই বলিয়া জামাতা, চাদর কাঁধে ফেলিয়া গমনোদ্যত হইলেন।

কপিল। করেন কি মোশাই? রক্ষা করুন, আপনি খানিক থাকুন, আমি মাকে একবার এ কথা বলে আসি—

রায়। পাগল, পাগল!—একথা মাকে বল্‌বার কোনও আবশ্যক নাই।

এই বলিয়া রায় মহাশয় ধীরপদে যাত্রা আরম্ভ করিলেন।

কপিল মহাসঙ্কটে পড়িল। ব্রাহ্মণকে আগুলিয়া ধরিতে তাহার সাহসে কুলাইল না;—পাছে পাগল-বামুনটা, তাহাকে কামড়াইয়া দেয়। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কপিল খানিক চুপ করিয়া রহিল; পরে রায় মহাশয় যখন ফটক পার হইয়াছেন, তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে অন্দরাভিমুখে দৌড়িল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে জননীকে গিয়া বলিল, "মা ঠাকরুণ! সর্ব্বনাশ হয়েছে! জামাই বাবু পালিয়েছেন—তাঁকে ধর্‌তে গেলেম, তিনি আমাকে কামড়াতে এলেন,—"

মা। (ভয়-চকিতনেত্রে) বলিস্ কি? বলিস্ কি?—দেখ্ শীগগির দেখ্;—তিনি কোথা পালালেন?

কপিল। মা, আসুন, দেখ্‌বেন,—ঐ দিকে, ঐ দিকে! ঐ ঐঃ—

কপিলের কঠোর কণ্ঠরবে গৃহ জাগিয়া উঠিল। ভৃত্য, বেহারা, দ্বারবান্,—যে যেখানে ছিল, সকলে একত্র হইল। মহা হুলস্থূল! সকলেই হলে দাঁড়াইয়া কেবল গোল করিতে লাগিল।

মাতা। (ধীরভাবে) কপিল, তুমি বাছা দেখত, তিনি কোন্ দিকে গেলেন—রাস্তায় যেয়ে তিনি কারো সঙ্গে এখনি হয়ত মারামারি কর্‌বেন,—শীঘ্র যাও,—পাঁড়ে তুমিও সঙ্গে যাও,—সকলেই গিয়ে তাঁকে খুঁজে নিয়ে এস,—

গৃহিনীর আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র, পাঁড়ে, দরোয়ান, ভৃত্য, খানসামা ঘেসেড়া,—সকলেই জামাই অন্বেষণে দৌড়িল।

গোল শুনিয়া, চাটর্জি-সাহেব বিপিনকে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসিলেন,—

"ইহা কি বিষয়ক গোলমাল! এবং ইহার বীজ-কারণই বা কি?—এমন সময় কাহার আবির্ভাব হইল?—"

বিপিন। ভগিনীর স্বামী পলাইয়াছেন। কপিল তাহাকে ধরিতে গিয়াছে।

চাটর্জি। আ—আ—কপিলের এই ন্যার্য্যানুরাগ-পূর্ণ, বীরোচিত কর্ম্মে, আমি সাহায্য প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। ভাই! ভাবিও না, হৃদয়ে এমন কথা স্থান দিওনা যে, আমি কপিলের বিজয়-গৌরবের অংশভাগী হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছি। রণজয়ের পর, কপিল সম্মানসূচক, মূল্যবান যে সকল উপাধি এবং উপহার পাইবে, তাহার একটীরও আমি ভাগ লইব না। কপিল, সেনাপতিত্বে বরিত হইয়াছে, সেনাপতিই থাকুক; আমি তাঁহার অধীনে লেফ্‌টনেণ্ট হইয়া কাজ করিব।

এই কথা বলিয়া চাটর্জি সাহেব, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিলেন।

বিপিন একটু ভীত হইয়া, সাহেব-বড়দাদার হাত ধরিয়া বলিল,—"আপনার আর সেখানে যাবার দরকার নাই—কপিলই, জামাই বাবুকে ফিরিয়ে আন্‌বে এখন।—"

চাটর্জি। এঃ—ছিঃ—তোমার ইংরেজী-উচ্চারণটা বড়ই দূষনীয়, ভ্রমপূর্ণ।

তোমার ইংরেজী কথাও ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ এবং প্রচলিত পদ্ধতি-বিরুদ্ধ। আমার ভাই হইয়া, আজও তুমি মহারাণীর ইংরেজী শিখিতে পারিলে না? যদি কোন ইংরেজ, এখানে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তোমার মূর্খতা দেখিয়া তিনি হাস্যসম্বরণ করিতে পারিতেন না এবং সে সময় আমিও তোমাকে, তাঁহার নিকট, আমার ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় করিয়া দিতেও সক্ষম হইতাম না।

চাটর্জি ক্রমশ আপনা আপনি বকিতে বকিতে নীরব হইলেন। অবশেষে নয়ন-যুগল মুদ্রিত হইল—চৈতন্য লোপ হইল। চাটর্জি ফুরাইল। বিপিন, নাগপাশ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, মায়ের নিকট দৌড়িয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এ দিকে, ব্রাহ্মণ স্কন্ধে চাদর ফেলিয়া, ভাগীরথী অভিমুখে, গুটি গুটি চলিয়াছেন। সমস্ত দিন অন্নাহার হয় নাই। রাত্রি তিনটার সময় উঠিয়া, আট ক্রোশ পথ হাঁটিয়া, বেলা ৯ টার সময় তিনি ষ্টেসনে পৌছেন। সেখানে স্নানাহ্নিক করিয়া, একটু জল খাইয়াছিলেন। পাকাদি করিয়া আহার করিতে সময়ও হয় নাই, সুবিধাও হয় নাই। তিনি বেলা সাড়ে দশটার সময় রেলগাড়ি চাপিয়া, বৈকালে সাড়ে চারি টার সময় শিয়ালদহে অবতরণ করেন। ব্রাহ্মণ,—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পরিশ্রমে বড়ই কাতর হইয়াছেন। ধন্য শরীর! রাত্রি তিনটার সময় উঠিয়া ৮ ক্রোশ পথ হাঁটা,—তার পর সমস্ত দিন অনাহার,—অবশেষে, রাত্রি সাড়ে-আটটা বাজিয়াছে; ব্রাহ্মণের এখনও পরিশ্রমের বিরাম নাই,—একক্রোশ পথ হাঁটিয়া গঙ্গাভিমুখে চলিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ পরম-হিন্দু। সন্ধ্যা ব্যতীত জলগ্রহণ করেন না। কোন্ সুব্রাহ্মণ করিয়া থাকেন? ওষ্ঠাগত প্রাণ হইলেও সেই কঠোরতপা, তেজস্বী ব্রাহ্মণ, গঙ্গাজলে সন্ধ্যাকৃত্য না করিয়া, কখন কি জলগ্রহণ করিতে পারেন? ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, ব্রাহ্মণ তাই ধীরে ধীরে, শুষ্কমুখে, সেই প্রসন্নপুণ্যসলিলা, জননী জাহ্নবীসদনে জীবন জুড়াইতে যাইতেছেন। গলি হইতে বাহির হইয়া, তিনি রাজপথের ফুটপাত ধরিয়াছেন মাত্র। এমন সময় কপিল খানসামা সদলবলে উপনীত হইল।

কপিল। ফিরুন ঠাকুর, ফিরুন!—আমাদের দফা সার্‌লেন আর কি? চলুন, ঘরে চলুন—এরাত্রে আপন মনে কোথায় যাচ্চেন বলুন দেখি?

কপিল এবং তাহার সহচরবর্গকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ চমকিত হইলেন। কপিলের কথা শুনিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলেন। ক্ষণেক নীরব রহিলেন।

কপিল ইত্যবসরে আবার বলিল,—

"পায়ে পড়ি ঠাকুর, ঘরে চলুন, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আর খুঁজিতে পারি না।—"

তখন ব্রাহ্মণ অতি গম্ভীরভাবে, ঈষৎ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "কপিল, তুমি পাগল হ'লে নাকি? ছি! আর মাতলামো করো না,—ঘরে যাও, আমি সন্ধ্যা-আহ্নিক করে আসচি—"

কপিলকে পাগল ও মাতাল বলাতে তাহার কিছু রাগ হইল। তাহার ইচ্ছা যে, সে স্বয়ং, ব্রাহ্মণের টীকি ধরিয়া টানিয়া আনে। কিন্তু সহসা সে কাজ করিতে ভরসা করিল না, প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণকে বলিল,—"আরে ঠাকুর, আর জ্বালাতন করো না, ভালোয় ভালোয় আমার সঙ্গে ঘরে চলো—"

ব্রাহ্মণ। দুর্বৃত্ত মাতাল! এই কি তোর মাতলামীর জায়গা? দূর হ, খবরদার আর আমাকে বিরক্ত করিস্ না—

ব্রাহ্মণের সেই তেজপুঞ্জ কলেবর, সেই জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু, সেই ধীর-গম্ভীর বাক্য দেখিয়া, শুনিয়া, কপিল নিতান্তই ভীত হইল। ভাবিল, পাগলের হাতে শেষে প্রাণ হারাবো নাকি? তখন সে, একটু দূরে দাঁড়াইয়া, পাঁড়েজীকে কাণেকাণে বলিল, "তোম সাম্নেকা পথ আগুলো, হ্যাম পশ্চাৎমে থাকুবো।" দ্বারবান দৌড়িয়া গিয়া ব্রাহ্মণের পথ রুদ্ধ করিল; ঘেসেড়া তাঁহার ডানপাশে দাঁড়াইল; আর একজন উড়ে খানসামা পশ্চাতে রহিল,—সেই উড়ের পশ্চাতে সেনাপতি কপিল-খান্সামা স্বয়ং অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পাঁড়ে পথ রুদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিল,—

"ঠাকুরজী! আপ্ এতনা রাৎমে কাঁহা যাতেহেঁ; রেলগাড়ীমে আপকে বহুৎ তক্লিফ্ হুয়া। হামারা সাৎ ডেরা পর চলিয়ে।

ব্রাহ্মণ। দেখো, ম্যয়নে কিছু মৎকরো; হাঁমারা তবিয়ৎ মান্দি হ্যায়—তোম্‌তো ব্রাহ্মণ হ্যায়—গঙ্গাকা কিনারাপর্ সন্ধ্যা কর্কে হ্যাম বাসাপর্ যাঙ্গে।

কপিল পশ্চাৎ হইতে বলিতে লাগিল,—"পাঁড়েজি তোম্ কি রকম লোক হ্যায়,—হাম্ বল্‌চি, তোম ঠাকুরকো ধরাধরি কর্কে ঘরমে নিয়ে চল—"

ব্রাহ্মণ তখন ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া, জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় উগ্রভাবে কপিলের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"দুর্বৃত্ত! ফের যদি মাতলামো করিস্, তাহা হইলে তোকে উপযুক্ত দণ্ড দিব—"

কপিল এই সময় একটা ভয়ানক গোলযোগ করিয়া উঠিল,—"বাবারে, মেলেরে, মেরে ফেল্‌লেরে, কে আছিস্‌রে, আমাকে ধর্,—কনেষ্টবল, কনেষ্টবল,"—কপিলের চাৎকারে রাজপথ প্রতিধ্বনিত হইল। এইরূপ গোলমালে পথে লোক জমিয়া গেল। ব্রাহ্মণ একটু চঞ্চলচিত্ত হইলেন; মনে ভাবিলেন, গতিক কি? কিন্তু তিনি কপিলের দিকে আর অগ্রসর না হইয়া, দ্রুতপদে গঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সম্মুখ-সমরে ভঙ্গ দিয়া, বিপক্ষ পলাইল দেখিয়া, কপিল লাফাইয়া উঠিল;—ক্রমে একটা হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিল,—"ঐ যায়, ঐ পলায়, ধর্ ধর্,—ক্যায়া পাঁড়েজী তোম্ কি কর্‌তা হ্যায়; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্যায়া মজা দেখ্‌তা হ্যায়?" পাঁড়েজী ভাঙ্গাভাঙ্গা সুরে; আস্তে আস্তে উত্তর দিল,—"হাম কেয়া ক'রে ভেইয়া, আংরেজকে মুলুকমে ভদ্দর আদ্‌মিকো হাম পাকড়নে নেহি সেকেঙ্গে।"

কপিল আরও ভয়ঙ্কর চেঁচাইতে লাগিল। সম্মুখে সেই ঘোঁড়ার ঘেসেড়া। সে, জাতিতে মুসলমান। নাম, বকাউল্লা। তাহাকে কপিল বলিল; "তোম বাবুকো নিমকখেয়ে ক্যায়া মাজা দেখ্‌চো; পাগলকো জল্‌দি পাকৃড়ে নিয়ে এসো"—

ব্রাহ্মণ এই অবকাশে দ্রুতপদবিক্ষেপে দুইরসী পথ অগ্রসর হইয়াছেন; মুখকমল শুকাইয়াছে; শরীর হইতে অবিরল ঘাম বাহির হইতেছে।

ঘেসেড়া; কপিলকে বলিল, "হুকুম মিলেত; হ্যাম আবি পাকৃড় লে-আনে সেক্তা হ্যায়"—

কপিল। হুকুম'ত হ্যাম বরাবরই দিচ্চি;—তুমি যদি জল্‌দী না পাকৃড়ো; হ্যাম মাঠাকুরাণীকে বলে দিয়ে; তোমরা নোকুরিমে জবাব দিবো।

ঘেসেড়া এই কথা শুনিয়া, ব্রাহ্মণকে ধরিতে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। কপিল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধর্ ধর্ রবে ছুটীল। মহাহুলস্থূল কাণ্ড। ব্যাপার দেখিয়া পাঁড়েজীও তাহাদের অনুসরণ করিল। উহাদের সঙ্গে সঙ্গে

প্রায় একশত দর্শকবৃন্দ ধাবিত হইল! সেই লোকমণ্ডলী, ব্রাহ্মণের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র ব্রাহ্মণ ফিরিয়া চাহিলেন। অমনি বকাউল্লা ঘেসেড়া, সেই ক্ষুৎপিপাসাশ্রমাতুর ব্রাহ্মণের দক্ষিণহস্ত সজোরে দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরিল। ব্রাহ্মণ অতি তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"নরাধম, পাপিষ্ঠ যবন! আমার হাত ছাড়িয়া দে।" এই কথা উচ্চারণ করিয়া, ব্রাহ্মণ বলপূর্ব্বক হাত ছাড়াইবার উপক্রম করিলেন। ঘেসেড়া গোখাদক,—দিল্লী-বাসী। বয়স ত্রিশ বৎসর। সে, বালককালে জুয়া খেলিত। ষোল বৎসর বয়সে নৌকার দাঁড় ছিল। এই সময় ডাকাতি অপরাধে তাহার দশ বৎসর মেয়াদ হয়। দ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, সে আর দেশে যায় নাই। কলিকাতায় ঘেসেড়া-গিরিরূপ মহাব্রতে নিযুক্ত আছে। বকাউল্লা গেঁটে জোয়ান,—শরীর যেন লোহা। ব্রাহ্মণ, বল-প্রকাশে বকাউল্লার হাত ছিনাইয়া লইবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া, সে, ক্রোধভরে তাঁহার হাত ছাড়িয়া, একেবারে তাহার গলা জাপ্টাইয়া ধরিল। ব্রাহ্মণের মুখ অবনত হইল! বকা-উল্লার দারুণ করাঘাতে, তাঁহার গলদেশে বিষম আঘাত লাগিল। ব্রাহ্মণ যন্ত্রণায়, অধীর হইয়া, "হরি, হরি; প্রাণ যায় প্রাণ যায়" বলিয়া উঠিলেন। কাপল মহা আনন্দে, লম্ফে ঝম্ফে হাঁকাহাঁকি করিয়া বলিয়া উঠিল,— "ঘেসেড়াজী, আচ্ছা শক্ত করে ধরো; যেন পালায় মৎ, কুছ্ ভয় করো না।" ব্রাহ্মণ অতি কাতরকণ্ঠে, বলিলেন,—"দুরাচার যবন! তুই সর্ব্বনাশ করিলি,—যজ্ঞোপবীত স্পর্শ করিলি,—আমাকে ছেড়ে দে।—"

ব্রাহ্মণের চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ জল পড়িতে লাগিল। মুখে অন্য কোন কথা নাই, কেবল বলিতে লাগিলেন, "আমায় ছেড়ে দে! আমায় ছেড়ে দে!"

গোলযোগ দেখিয়া একজন; কনষ্টবল দূরে দাঁড়াইয়া একপাশ হইতে মিটি মিটি চাহিয়া, উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া কাপলের আরও সাহস বাড়িল! কাপল বলিল,—"কনষ্টবলজী, এ আদ্‌মী পাগল হ্যায়,—রাস্তামে লোকজনকে মারতা ধরতা হ্যায়। বাবুর হুকুমসে হাম পাগলকে ধরে নিয়ে যাচ্ছ।"

কনষ্টবল। কোন্ ব্যাবু?

কপিল। ডেপুটী বাবু, ৫৫—নং গলিমে রয়তা। তোম পছন্তা নেহি?

কনষ্টবল। ওহো, হ্যাম সমজ্‌লিয়া? বাবু বড় ওমদা আদমী হ্যায়। পূজামে হুঁহা একরূপেয়া বকশীশ মিলা। ও পাগলা, বাবুকে কোন্ লাগ্‌তা?

কাপল। বাবুকে ঐ পাগল জামাই হ্যায়। ছেলেবেলাসে পাগল, হ্যামকো গালমে আজ কামড়ায় দিয়া।

কনষ্টবল। জল্‌দি জল্‌দি বাউলাকে ধরমে লে যাও,—তাল বন্দ করো।

এইরূপে কনষ্টবল, কপিল এবং পাঁড়েজীর সাহায্যে, সেই ঘেসেড়া, ব্রাহ্মণের গলা এবং হাত ধরিয়া গৃহাভিমুখে টানিয়া আনিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ আর কথা কহিলেন না, নীরবে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তিনি কেবল একবার মুখ ফুটিয়া ঘেসেড়াকে বলিয়াছিলেন,—“ঘাড় ছেড়ে দাও, আমিত তোমাদের সঙ্গেই যাইতেছি।”

এই কথা শুনিবামাত্র কনষ্টেবল-প্রভু ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন,—“ক্যায়া বাউরা বকবক্ করতা হ্যায়, গোলমাল করেগা তো হ্যাম তুনে হাজতমে লে যাগা।” মুখে এই মধুরবাণী বলিয়া, কনষ্টবল ব্রাহ্মণের পিঠে একটা সুমিষ্ট ধাক্কা প্রদান করিলেন। সেই মৃদুমন্দ মনোহর কনষ্টবল-করস্পর্শে ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠপ্রদেশ ঈষৎ ফুলিয়া উঠিল, সর্ব্বশরীর শিহরিল; মাথা ঘুরিল! ব্রাহ্মণ নীরব; পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিতে লাগিল; তাঁহার গলদেশ-বিলম্বিত যোজ্ঞোপবীত মুসলমান-বকাউল্লার বামকর-স্পর্শে কলঙ্কিত হইতেছে দেখিয়া, তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া আবার জল পড়িল। কিন্তু উপায় কি? বকাউল্লা তাঁহার ডান হাত ধরিয়া রাখিয়াছে; এবং বাঁ হাতের সাহায্যে সে, গলা টিপিয়া এবং পৈতা চাপিয়া ধরিয়াছে। ব্রাহ্মণ তখন নিরুপায় ভাবিয়া, নিজ বামকর দিয়া ধীরে ধীরে, বকাউল্লার হাত হইতে পৈতা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। ঘেসেড়ার হাতে ঈষৎ টান পড়িল। ঘেসেড়া চমকিয়া উঠিয়া চীৎকার করিল,—“বাউরা, হ্যামারা হাত ছিনিলেকে ভাগ্‌তা হায়.—”

কপিল। কেয়া হোয়েছে,—ছেড়ে দাও মৎ, পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো—

কনষ্টবল তখন দৌড়িয়া গিয়া পশ্চাৎ হইতে ব্রাহ্মণের কোমর জড়াইয়া ধরিল। সেই উড়ে-খানসামাটা গিয়া তাঁহার বাঁ হাতটা দৃঢ়রূপে চাপিয়া রাখিল। ঘেসেড়া বজ্র কড়াটিপ্‌নি দিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। মর্ম্মাহত কাতর ব্রাহ্মণ—"ত্রাহি মে পুণ্ডরীকাক্ষ!" রবে এক গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। এই সময় স্বয়ং কপিল দৌড়িয়া গিয়া, সজোরে ব্রাহ্মণের তলপেটে এক লাথি মারিয়া বলিল—"চল্‌, বেটা, বিটল বামুন! ঘরের কাছে এসে, মন্তর আউড়ে, আবার ন্যাক্‌রা জুড়ে দিলে।"

ব্রাহ্মণের মুখ শাকবর্ণ হইল। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। চক্ষুদ্বয় কপালে উঠিল। ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া কনষ্টবলের গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন। কনষ্টবল এইবার মহা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিল। ব্রাহ্মণের দেহ নিথর, নিশ্চল, অসাড়, অনড়; তাঁহার মুখ কেবল ঝুলিতে লাগিল।

নিতাই বলিল,—"বুজরুক্‌ বামুনটো কল্লা কচ্চে। ঠেলেঠুলে এখন ঘরে ঢোকাতে পাল্লে হয়! তার পর আমি ওকে একবার দেখ্‌বো।"

এইরূপ গোলমাল করিয়া, ধরাধরি করিয়া, ক্রমে তাহারা, ব্রাহ্মণকে লইয়া, গৃহদ্বারের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল।

ব্রাহ্মণ আরও বিবর্ণ হইলেন,—মুখ দিয়া ফেন-উদ্গত হইতে লাগিল। পাঁড়েজী তখন বিষম ব্যাপার কতকটা বুঝিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিল,— "তোম্‌-লোক ক্যা করতা হায়? ব্রাহ্মণতো মরনেকে মাফিক্‌ হুয়া,—ছোড় দেও ওস্‌কো, ছোড় দেও।" এই কথা বলিতে বলিতে পাঁড়েজী,—কনষ্টবল এবং ঘেসেড়াকে সরাইয়া দিয়া, স্বয়ং গিয়া ধরিল। দেখিল, ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা নাই, দেহভার শিথিল, মুখ লুটাইয়া পড়িয়াছে। অমনি সে, আস্তে ব্যস্তে তাঁহাকে ভূতলে শোয়াইল; এবং আপন কোলে তাঁহার মাথা তুলিয়া লইল।

কনষ্টেবল। (ধীরে ধীরে) হ্যামারা মালুম হোতা হ্যায়, ব্রামন্‌ কুচ নেশা কিয়া,—দারু আরু পিয়া—"

মুখ হইতে এই মধুরবাণী নির্গত করিয়া, কনষ্টবল হঠাৎ দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

পাঁড়েজী, কপিলকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—"ভেইয়া, জলদি থোড়া পানি লে-আও! মা-জীকে খবর্ দেও, ছোট বাবুকো খবর্ দেও,—বাত আচ্ছা হ্যায় নেই—"

কপিল কতক পাড়েজীকে শুনাইয়া, কতক আপন মনে, নাকিস্বরে বলিতে লাগিল,—"আমি আর পারি না বাবু! সন্ধ্যাবেলা অবধি খেটে খেটে আমার প্রাণ উচ্ছুগ্‌গু হলো—ঘুরে ঘুরে নাড়ী পাক পেয়ে গেলো। বৈকালে সেই একট জল খেয়েচি বৈত নয়,—এতখানি রাত হলো, না খেয়ে আর খাটবোই বা কত? তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্চে—"

পাঁড়েজি একটু রাগ করিয়া বলিল,—"ক্যায়া জি, তোম্ বক্‌বক্ করূতা? দেখ্‌তেহো নেহি,—জামাই বাবুকে মুঃসে পানি নিক্‌লতা? জলদি খবর্ দেও,—ঠাণ্ডা পানি লে আও—" এই কথা বলিয়া পাঁড়ে স্বয়ং দ্বারদেশ হইতে ভীতিব্যঞ্জক বিকটস্বরে ডাকিল,—"ছোট বাবু, আপ্ জলদি আইয়ে—"

কপিল কি করে! অগত্যা পা পা করিয়া ধীরে ধীরে গৃহপ্রবেশে উদ্যত হইল। যেন সে বড় কাহিল, কতদিন পায় নাই, ঠেলিলে পড়িয়া যায়।

এমন সময় ডেপুটীবাবুর গৃহে একটা মহা গোল উঠিল,—"ওমা, আমার কি হলো গো, বাছা আর কথা কয় না কেন গো!"—এই বলিয়া গৃহমধ্যে এক মহাক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইল। দালানের উপরে দুপ দাপ জুতার শব্দ পাওয়া যাইতে লাগিল। উপরতলে কাহারা যেন এঘর ওঘর দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। ক্রন্দনধ্বনি মধ্যে গৃহিনীর গলা পাইয়া পাঁড়েজী ভাবিতে লাগিল;—"ক্যায়া জানে, অন্দরমে আউর কোন্ ফসাদ হুয়া"

কপিল-খানসামা দ্বিতলে কান্নার গোল শুনিয়া মনে মনে গভীর চিন্তা করিতে লাগিল,—"আমি উপরে যাই, কি, না যাই। উপরে যে রকম গোল উঠেছে, অবশ্যই কোন বিপদ ঘটে থাকবে। আমাকে দেখতে পেলেই সবাই ঠুঁটো হয়ে বসে থাকবে; আর আমায় ফরমাস্ কোরে কোরে, আমার প্রাণটাই বার্ কোরে নেবে। নীচে থাকলেই

বা সোয়াস্তি কই?—পাঁড়ে বেটা তিক্ত করে মারবে। আমি কোথাও যাবো না—নীচের ঘরে চুপে চুপে লুকিয়ে বসে থাকি।

কপিলচন্দ্র এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় বিপিনবাবু সাঁড়ি হইতে দ্রুতপদে দুপ্ দুপ্ শব্দে নিমেষ মধ্যে নামিয়া আসিয়া, কপিলকে দেখিয়া, অতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—"কপিল; কপিল, সর্ব্বনাশ হয়েছে, শীঘ্র উপরে যা, শীঘ্র উপরে যা—"

কপিল। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে)—আঁা, কি হয়েছে, ছোটবাবু!—কি হয়েছে ছোটবাবু!—"কপিলের চক্ষের আর পলক পড়িল না—

বিপিন। বড়দিদির "ফিট" হয়েছে, কিছুতেই চেতনা হচ্চে না—মা বড় কাঁদ্‌চে। তুই যেয়ে দিদির চোখে জলের ঝাপটা দিয়া দেখ দেখিন্? আমি ডাক্তার বাবুর বাড়ী যাচ্চি—

এই কথা বলিয়া বিপিন চলিল।

কপিল। বলেন কি ছোটবাবু! বলেন কি ছোটবাবু? সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!—

এই কথা বলিতে বলিতে কপিলও অন্দরাভিমুখে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। যেন মদমত্ত ঐরাবতের বল তাহার শরীরে তখন উপজিল। সে, উপরে উঠিয়া, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায়, লম্ফঝম্ফ দিয়া, বেগে কমলিনীর গৃহে প্রবেশ করিল। সে কক্ষ তখন লোকে লোকারণ্য; এবং কলরবে পরিপূর্ণ। কপিল অতিশয় কোপ প্রকাশ করিয়া প্রথমে বলিল,—"মা ঠাক্‌রুণ! কোরেচেন কি? এ ঘরে এত গোল কেন? এত লোক কেন? নিশ্বাসের গরমে যে, দিদি বাবুর ব্যারাম বাড়বে। সকলে সরে যাও;—তফাৎ তফাৎ।—"

ছেলে পিলে সকলকে সরাইয়া দিয়া, কপিল বাঁ হাতে এক কুঁজা জল লইয়া, কমলিনীর শিয়রে উপবেশন করিল, এবং কুঁজো হইতে জল লইয়া ধীরে ধীরে কমলিনার চোখে, মুখে, ঝাপটা মারিতে লাগিল।

জননী জিজ্ঞাসিলেন "কপিল, জামাই কোথা গেলেন?"

কপিল ঈশারায় উত্তর দিল। হাত নাড়িয়া, মুখভঙ্গি করিয়া বোঝা হল,—এখন কথা কহিবেন না, কথা কহিলে দিদিবাবুর ব্যারাম বৃদ্ধি

প্রাপ্ত হইবে। গৃহিণী নীরব হইলেন। কপিল উঠিয়া, দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল;—"মা! এ কি করেছেন? দিদিবাবুর গায়ের বডির বোতাম খুলে এখনও দেন নাই? তাইতে এখনও ফিট যায় নাই,-আপনি শীঘ্র একখানা পাখা নিয়ে আসুন।"

জননী তখন পাখা আনিতে গৃহান্তরে গমন করিলেন।

এদিকে কপিল দিদিবাবুর জামার বোতামখোলা কার্য্যে নিমগ্ন হইল। দিদিবাবুর নড়নচড়ন নাই, কথাবার্ত্তা নাই, যেন এলাইয়া পড়িয়া আছেন;—মুদ্রিত নয়ন যুগল কড়িকাঠ পানে; হস্তদ্বয় মরা-মানুষের হাতের মত বিছানায় ছড়াইয়া আছে; রাঙা পা দুখানিও তাই। গৃহিণী, পাখা লইয়া আসিয়া কপিলের হাতে দিলেন। কপিল হুহু শব্দে পাখা চালাইতে লাগিল, সেই পাখা-নিঃসৃত (?) বায়ুর সাহায্যে কমলিনীর সুকোমল গাত্রস্থিত বস্ত্রগুচ্ছ চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে জলছিটা-বর্ষণ কার্য্যও চলিল। তথাচ কমলিনীর ফিট ঘুচিল না। জননীর চোখের জলও কমিল না।

পাঠক! এখন কোন্ দিক্ দেখিবেন? সেই দ্বারস্থিত, ভূপতিত মর্ম্মাহত, মূর্চ্ছিত ব্রাহ্মণের পরিণাম দেখিবেন?—না, কমলিনীর শুশ্রূষা দেখিবেন? কোন্ পথে যাবেন?

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

মডেল ভগিনী।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাঠক! একদিকে হিন্দু-ব্রাহ্মণের চরম অবস্থা; অন্যদিকে শিক্ষিতা মহিলার উন্নতির চরম সোপান; একদিকে "অসভ্যতা, কুসংস্কার," অন্যদিকে "সভ্যতা, সু-সংস্কার"—কোন্ দিক দেখিবেন, কোন পথে যাবেন?

আমরা গ্রন্থকার-মানুষ। বুঝি ভাল। জ্ঞানও অনেক, বিদ্যাও অগাধ। তাই বলিতেছি, এখন, ও দুপথের কোন পথেই যেয়ে কাজ নাই। এ সঙ্কটকালে, একটা মাঝামাঝি সোজা পথেই যাওয়া ভাল।

ডেপুটীবাবু কে? সেই জামাইবাবু ব্রাহ্মণই বা কে? আর সেই মহিলা-কুল-পঙ্কজ-সবিতা কমলিনীই বা কে? কেউ কিছু জান কি? হু হু করে গল্প পড়ে গেলেই ত হয় না? আগে বোঝ, তবে ত শিখিতে পারিবে?

ডেপুটী বাবু চিরকাল ডেপুটীগিরিই করেন। কেহ কেহ তাঁহাকে "আজন্ম-ডেপুটী" বলেন। বস্তুত অনেক প্রবীণ পুরুষ বলিয়া থাকেন, "আমরা ত উহাঁকে ছেলেবেলা থেকেই ডেপুটী দেখিতেছি।" তিনি ৫৮ সালের সিপাহী-যুদ্ধের পূর্ব্বে, কি পরে, রাজকাজ আরম্ভ করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাহার মীমাংসা হইল না। আরও একটা গুরুতর বিষয়ের আজও কেহ মীমাংসা করিতে পারিল না;—ইংরেজী বিদ্যেটা তাঁর কোন্

কালের?—এন্‌ট্রেন্স-এলে-বিয়ে কালের; না সেই জুনিয়ারি-সিনিয়ারি কালের? নব্য তত্ত্বানুসন্ধায়ী প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ এ বিষম সমস্যা পূরণ করিবার জন্য বহুচেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। অবশেষে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে এ বিষয়ের ওকালতনামা দিবারও কথা হয়। এরূপ শুনা গিয়াছে, উপযুক্ত ফী পাইলে, ডাক্তার মিত্র, ভাষা-বিজ্ঞান এবং শব্দ-বিজ্ঞানের সাহায্যে, একথা প্রমাণ করিয়া দিতে রাজী আছেন।

যাইহোক, ডেপুটী বাবুর হাতের ইংরেজী লেখাটী অতি পরিষ্কার। গোটা গোটা সতেজ ছাঁদ—যেন মুক্তা বর্ষিয়া যায়। এতখানি তাঁর বয়স হইল, টানা-লেখা, ভাঙা-লেখা, কাকে বলে, তা তিনি জানেন না! অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যেমনই তাড়াতাড়ি লিখুন না কেন, সেই গোটাগোটা হরপই তাঁর কলমের মুখ দিয়া বাহির হইবে। তবে তাড়াতাড়ি লেখাটা তাঁর অভ্যাস কম। তিনি বলিতেন, "মানুষের কাজ অল্প, সময় অধিক; আমরা অনেকটা সময় বাজে কাজে বৃথা নষ্ট করি, সুতরাং অনর্থক সময় নষ্ট না করিয়া, ধীরে ধীরে যত্ন করিয়া লিখিয়া, সেই সময়টা পূরণ করিলে সময়ের সদ্ব্যবহার করা হয়।"

তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা যে কত দূর হইয়াছিল, তাহাত আমরা একৃতরফা প্রমাণ করিতেও অক্ষম হইলাম। সে দোষ অবশ্যই তাঁহার নহে, দোষ আমাদের নিজ-জ্ঞানের, এবং নিজ-শিক্ষার। তবে এটা এক রকম বুঝা গিয়াছে,—হয় তিনি অতি-পণ্ডিত, না হয় তিনি অতি-মূর্খ, অথবা মাঝামাঝি "অতিপণ্ডিত-অতিমূর্খ।"

ডেপুটী বাবুর জ্ঞানের পরিচয় নাই বা পাইলাম; তাঁহার বাপকে বিলক্ষণ জানি। বাপের নাম নরহরি ঘোষাল। নিবাস কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত কোন পল্লীগ্রামে। নরহরি তালুকদার; তালুকগুলি সমস্তই পত্তনিবিলি আছে, খাসে একখানিও রাখেন নাই। তিনি গোলমালপ্রিয় লোক নহেন। নায়েব, গোমস্তা, নগ্‌দী, চৌকীদার প্রভৃতিকে লইয়া একটা মহা হাঙ্গাম করিতে ভাল বাসেন না। একমাত্র গলায়-পড়া-কুটুম্বের ছেলে তাঁহার কারপরদাজ; ভৃত্য একমাত্র;—দরোয়ানগিরি এবং খান্‌সামাগিরি—এ উভয় কাজই তাহার জেম্মা; এবং একমাত্র স্বয়ং তিনি। এই

তিন জনের দ্বারা বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হয়। কোন গোলযোগ নাই,—সন সন, মাস মাস, কিস্তি কিস্তি যথানিয়মে পত্তনিদারগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় হয়। বেশ সুখ স্বচ্ছন্দ। যেমন করিয়া হউক, তাঁহার শালিয়ানা সাত আট হাজার টাকা মুনফা আছে।

নরহরির পুত্রও একমাত্র। তিনি ৩৮ বৎসর বয়সে, "হলোনা হলোনা" করিয়া বহুযত্নে, এই পুত্র-রত্ন লাভ করিয়াছেন। পুত্রের নাম শ্রীরামদাস! উপন্যাস-লিখিত নরনারীগণের চরিত্র একটু স্বতন্ত্র। পরিদৃশ্যমান মানবকুল অপেক্ষা তাঁহাদের সকল বিষয়ই একটু উচ্চ-অঙ্গের। সুতরাং শ্রীরামদাস, জন্মিবার পর দিন হইতেই, শুক্লপক্ষশশীকলার ন্যায় প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহার অঙ্গের আভায় দশ দিক্ উজ্জ্বলীকৃত হইতে লাগিল। তাঁহার কথা সুধাবৎ মধুর হইল, নয়ন খঞ্জন-গঞ্জন হইল।" ওষ্ঠাধর বিম্বফলের ন্যায় টুক্‌টুক্ করিতে লাগিল। হস্তাঙ্গুলির দশ-নখে দশচন্দ্র হাসিল—কেশকলাপ পার্ব্বতীয় মৃগীর চামরকে নিন্দা করিল। অধিক আর কত বলিব, সংসারে যে সকল উপকরণ একাধারে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তৎসমস্তই সেই পুত্র-রত্নে নিহিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এ হেন শ্রীরামদাসই আমাদের ডেপুটী বাবু। তিনি বাল্য-বিদ্যাটা গ্রাম্য-পাঠশালেই শেষ করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সের বক্ষে যখন তিনি পদাঘাত করিলেন, তখন গ্রামের সমস্ত ভদ্র প্রবীণ ব্যক্তি, নরহরিকে এক বাক্যে বলিলেন, "শ্রীরামকে আর এ পাড়াগাঁয়ে রাখা উচিত নয়; আপনার সন্তান যেরূপ সুলক্ষণসম্পন্ন, তাহাতে ভবিষ্যতে উনি একজন বড়লোক হইবেন; অতএব শ্রীরামকে ইংরেজী শিক্ষার্থ কলিকাতায় পাঠান উচিত।"

বিজ্ঞ প্রতিবেশিগণের কথায় বিশেষ-আপত্তি উত্থাপন করা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ; সুতরাং নরহরি ঘোষাল, পুত্রকে ইংরেজীজ্ঞানলাভার্থ কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। বহুদিন ধরিয়া শ্রীরাম, ইংরেজীর গূঢ় মর্ম্মনিচয় অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ের কলিকাতার ইতিবৃত্তটা কিছু তিমিরাচ্ছন্ন কেমন স্কুলে, কার কাছে, কি প্রণালীতে তিনি পড়িতেন, তাহা ইতিহাসে লেখেনা। লোকে জানিত, তিনি কেবল ইংরেজীভাষায় পরমতত্ত্ব লাভ করিতেছেন। তবে শ্রীরামদাসের তাৎকালিক জীবনের একটা মহাঘটনা দেশীয়দের স্মৃতিপথে আজও অঙ্কিত আছে। বিদ্যাশিক্ষার চতুর্থ বৎসরে শ্রীরাম কলিকাতা হইতে পিতাকে পত্র লেখেন,—"আপনি ডাকের পত্রে, বা অপর কোন পত্রে শ্রীরামদাস ঘোষাল, এইরূপ শিরোনামা লিখিবেন না। শুধু, শ্রীরামচন্দ্র ঘোষাল লিখিলেই যথেষ্ট হইবে। কলেজের বড় সাহেবের অনুমতি অনুসারে কলেজে আমার ঐ নামই প্রচলিত হইয়াছে।" নরহরি পত্র পাইয়া ভাবিলেন—হঠাৎ সাহেব, ছেলের আমার নাম পরিবর্তন করিয়া দিল কেন? বুঝি ইংরেজীশিক্ষার এইরূপই নিয়ম হইবে।"

এদিকে তখন শ্রীরামকে লইয়া একটা বিভীষণ হৈ হৈ পড়িয়া গিয়াছিল। দূরে অদূরে, কাছে, সম্মুখে, যেমন অবস্থাতেই হউক, শ্রীরামচন্দ্র নয়নপথের পথিক হইলেই, ছাত্রমণ্ডলী অমনি রামায়ণের সুরে গাহিয়া উঠিত,—

শ্রীরামের দাস আমি অঞ্জনানন্দন।
ল্যাজ-সাটে কাঁপে মোর এ তিনভুবন।

ইহার পরই অন্য এক দল ছাত্র গাইত ;—

ঘরেতে কেশরী ছিল দুর্জ্জয় বানর।
না মেনে পবনা ধরে অঞ্জনার কর॥

আর এক দল গাইত ;—

রামদাস নামে আমি বিদিত সংসার।
মুখটী পুড়িয়ে দিলে রাবণ লঙ্কার॥

বালকগণ এই সকল কথা বলিতে না বলিতে, শ্রীরামের মন-আগুন একেবারে ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিত; রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে নিশ্বাসবায়ু বহিত। ছিন্নকণ্ঠ কপোতকে ধড়ফড় করিতে দেখিয়াছি, উত্তপ্ত তেলে খল্‌সে মাছের ছটফটানি দেখিয়াছি, ঘূর্ণীতবায়ুর বিষম বিক্রম দেখিয়াছি, পদ্মা নদীতে প্রবল জলের প্রলয়-পাক দেখিয়াছি, কিন্তু এমনটী কখনও দেখি নাই,—শ্রীরামের তদবস্থার সেই অলৌকিক প্রক্রিয়া কখনও দেখি নাই। রেগে, চোক কপালে তুলে, দাঁত কিড়িমিড়ি করে, শ্রীরাম যে কোন্ দিকে ছুটোছুটী করিয়া, কোন্ পথ দিয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে, নিরপেক্ষ দর্শকমণ্ডলী তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিত না সে লম্ফ, ঝম্ফ, দম্ফ, কম্ফ; সে অগ্রগমন, সে নরদৌড়ন, সে বিদ্যুৎ-বেগে পথ-পরিবর্ত্তন, সে মৌখিক গভীর গর্জ্জন,—সেই কালিকালের মহাকুরু-ক্ষেত্র বর্ণনার জিনিস নহে, অনুভূত হইবারও উপাদান নহে, কেবল স্বচক্ষে ফ্যাল্ ফ্যাল্ দেখিবার সামগ্রী। শ্রীরাম দৌড়িবার কালে উচ্চরবে বলিতেন, "শ্যালারা জানিস্ না বুঝি, এখনি এক চড়ে, মেরে গুঁড়ো করে ফেল্‌বো—" বালকগণ "ধল্লেরে ধল্লেরে" বলিয়া দৌড়িয়া পলাইত। শ্রীরাম বলিতেন, "শ্যালারা পালাস্ কেন? একবার দাঁড়িয়ে থেকে মজা দেখ্‌তে পাল্লি না"—বালকগণের ত মারামারি করা ইচ্ছা নয়, কেবল শ্রীরামকে রাগাইয়া উন্মত্তপ্রায় করাই তাহাদের একমাত্র অভিলাষ। বালকগণের পলায়ন দেখিয়া শ্রীরাম ভাবিতেন, তিনি অদ্বিতীয় বীরপুরুষ, তাঁহার ভয়ে, সকলে রণে ভঙ্গ দিল। এই ভাবিয়া "শ্যালারা শ্যালারা" শব্দে তাহাদের পিছু পিছু ছুটিতেন। তাহারা দৌড়িয়া আরও খানিক দূরে গিয়া, আবার সেই অনির্ব্বচনীয় কবিতা আবৃত্তি করিত। যে সকল ছোট

ছোট ছেলে দ্রুত দৌড়িতে পারিত না,—ভাল মন্দ কিছুই বুঝিত না, দলে থাকিয়া, কেবল হাসির সময় হাসিত, গোলের সময় গোল করিত, শ্রীরাম তাহাদিগকে সম্মুখে পাইয়া, উত্তম মধ্যম প্রহার করিতেন।

ক্রমে উভয় পক্ষেই অত্যাচারের বৃদ্ধি হইল। শ্রীরাম একদিন চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে, ক্রন্দনের উচ্চরব তুলিয়া কলেজের বড় সাহেবের পায়ে ধরিয়া বলিলেন,—"আমাকে রক্ষা করুন, আমি মারা যাই; সকলে এক যোট হয়ে আমাকে মেরে ফেল্লে।" বড় সাহেব অতি দয়ালু, অমায়িক লোক,—শ্রীরামের কান্না দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। কিন্তু একটা বড় বিপদ ঘটিল, শ্রীরামের কি হইয়াছে, কেন সে কাঁদিতেছে, তাহার কিছুই তিনি বুঝিতে পারিলেন না। সাহেব যতই জিজ্ঞাসেন, "শ্রীরাম কি হয়েছে?" শ্রীরামের কান্নার সঙ্গেই কথা জড়াইয়া যায়। 'অ্যাঁ অ্যাঁ ঐ ওরা বলে, 'ঘরেতে কেশরী ছিল' অ্যাঁ অ্যাঁ—অমনি চক্ষু ফাটিয়া গণ্ডস্থল বহিয়া, বক্ষ ঝরিয়া, শ্রীরামের জল পড়িতে থাকে। সাহেবত এক ঘণ্টায় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সেদিন বাপু বাছা করিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া তিনি শ্রীরামকে বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। তিন চারি দিন তদারকের পর, একজন বাঙ্গালীশিক্ষকের সাহায্যে, অবশেষে সাহেব প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, কয়েকটি বালকের ১০৲ টাকা করিয়া জরিমানা করেন। এই-রূপ প্রকাশ ছিল যে, শ্রীরামই গোপনে ঐ জরিমানার টাকা বালক-গণকেই প্রদান করিয়াছেন! এমন কথাও প্রকাশ হইয়াছিল, বালকগণ গোপনে শ্রীরামকে ভয় দেখাইয়াছিল,—"যদি তুমি আমাদের জরিমানার টাকা না দেও, তাহা হইলে আমরা প্রত্যহ রাত্রি দশটার পর আসিয়া তোমার বাটীর ধারে দাঁড়াইয়া, ঐ "আসল রামায়ণ আবৃত্তি করিব!" শেষে এ কথাও প্রকাশ হইয়া পড়িল, শ্রীরাম গোপনে একদিন সর্ব্ব-সমক্ষে বলিয়াছিলেন,—"আমি উহাদিগকে ভয়ে টাকা দিই নাই। বন্ধুতার অনুরোধে পরোপকার জন্ত ঐ টাকা দিয়াছিলাম।"

যাহা হউক, এই গোলযোগের অব্যবহিত পরে, শ্রীরাম এক দিন প্রিয়বয়স্তগণের পরামর্শে কালেজের বড় সাহেবের নিকট দরখাস্ত

করিলেন, "আমার নাম শ্রীশ্রীরামদাস ঘোষাল নহে, আমি কেবল, রামচন্দ্র ঘোষাল। অতএব রেজেষ্টরি খাতায় আমার সাবেক নাম কাটিয়া, হালের নামটী যেন লেখা হয়, এবং সকলে আমাকে যেন আজ হইতে রামচন্দ্র ঘোষাল বলিয়া ডাকে।" সাহেব দরখাস্ত পড়িয়া তথাস্ত বলিয়া হুকুম দিলেন। সর্ব্বগোলযোগ কাটিয়া গেল। পৃথিবী নীরব হইল। এতদিনে রামদাস, রামচন্দ্র হইলেন। দার্বিণের ইভোলিউসন-থিওরি সফল হইল, এবং লোকে যে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে "ছিরাম ছিরাম" করিয়া খেপাইত, তাহাও ঘুচিল। এই নিমিত্তই শ্রীরাম—বিষ্ণু!—রামচন্দ্র পিতাকে লিখিয়াছিলেন, পত্রের শিরোনামায় যেন তাঁহার নাম রামচন্দ্র ঘোষাল লিখিত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দূর হউক, বাজে কথা। এখনও অনেক আসল কথা বাকি। রামচন্দ্র বার বৎসর কাল কলিকাতায় ইংরেজী পড়েন। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ শিক্ষাদীক্ষাও পাইয়াছিলেন; "উনবিংশ শতাব্দীর" সেই সবে সূত্রপাত; সুতরাং সহবৎ, সদালাপ, সুনীতি সুরুচি এ সবের কতকটা তিনি আভাসও পাইয়াছিলেন। কেমন করিয়া ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতে হয়, তাহাও তিনি একটু আধটু শিখিয়াছিলেন।

পল্লীগ্রামে নামডাক উঠিল, রামচন্দ্র লেখাপড়ায় অদ্বিতীয় হইয়াছেন; জ্ঞান এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁর যুড়ি মেলে না। পিতা মাতা আশা করিতে লাগিল, কোম্পানী ডাকিয়া লইয়া গিয়া রামচন্দ্রকে কবে রাজতক্তে বসায় আর কি! কিন্তু আজকাল করিয়া, প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল; তথাচ রাম রাজপাঠে বসিলেন না।

পুত্র রামচন্দ্র, পূজার সময় বাটীতে আসিলে, পিতা নরহরি, রাজতন্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্র প্রায় একপ্রহরকাল ধরিয়া পিতার কথার উত্তর দেন। সেই ইংরেজী ধরণের উত্তর, সেই ইংরেজীর বুকনি মিশানো কথা, পিতা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। নরহরির বুদ্ধিহীনতা দেখিয়া রামচন্দ্রের কিঞ্চিৎ দুঃখ হইল; তিনি মনে মনে বলিলেন, "হায়! হায়! কি আপশোষ, নরহরি কি আহাম্মক! অদ্য আমার জ্ঞানের পরিচয় পাইবার জন্য তাহাকে ঈশ্বর এ সুবিধা দিয়াছিলেন, কিন্তু নরহরির দুরদৃষ্টবশত, সে (নরহরি) আজও আপনাকে সুখী করিতে পারিল না। এই সমাজনীতিমিশ্রিত রাজনীতির কথাগুলি কি আমার অদ্য বৃথাই গেল? বেণাবনে কি মুক্তা ছড়াইলাম?" ফল কথা, ইংরেজী-বিদ্যার সাহায্যে, রামচন্দ্রের দিব্য জ্ঞান জন্মিয়াছিল। তাঁহার মতে, "পিতা-জাতীয় লোকগুলা স্বভাবত, মোটাবুদ্ধি। অনুদারচিত্তে তাহারা কেবল টাকা রোজগারের চেষ্টায় ফেরে, খায় দায়, থাকে। তাহারা সমাজতত্ত্ব জানে না, রাজনীতির গূঢ় মর্ম্ম বুঝে না, কেবল পেট ভরিলেই পৌষ মাস। বিশেষত, তাঁহার নিজ পিতা ত

অতি বোকা। জমিদারীর মুনফাটী কড়ায় গণ্ডায় আদায় করা ছাড়া, এ সংসারে সে আর কিছুই বুঝে না। এ ঘোরতর রাজনীতির আন্দোলন কালে, এ সমাজবিপ্লব সময়ে, রামচন্দ্রের কলিকতার বাসাখরচ যে মাসিক ৫০৲ টাকায় কুলায় না, তাহা কি সে বুঝিতে পারে? নরহরির তেমন হেড্ কৈ, তেমন প্রতিভা কৈ?”

রামচন্দ্র অগত্যা সেই রাজতত্ত্ব-সম্বন্ধিনী কথা, নরহরিকে আবার অনর্গল বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। নরহরি এবার অগত্যা সে কথার এইরূপ ভাব বুঝিলেন, চাকুরি করা,—পরাধীনতা, দাসত্ব। রামচন্দ্র এ ধরাধামে কাহারও তোষামোদ করিবেন না, স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবেন। “মনে করিলেই অদ্যই আমার চাকুরি হইতে পারে। একটু মুখের কথা খসানর অপেক্ষামাত্র। গবর্ণর সাহেবের এই একটা ভয় হইয়াছে, তিনি আমার কাছে চাকুরির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলে, পাছে আমি চাকুরি না লইয়া তাঁহার অপমান করি। গবর্ণরের ইচ্ছা, আমি অগ্রে তাঁহাকে চাকরির কথা বলি কিন্তু প্রাণ থাকিতে তাহা আমি পারিব না। এত দিনের পরিশ্রমলব্ধ, প্রতিভা অর্জ্জিত লেখাপড়াটা কি এক দিনে এক মুহূর্ত্তে মাটী করিব?”

পিতা অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া, ধীরভাবে পুত্রকে বলিলেন, “তুমি যদি গবর্ণর সাহেবকে না বল, আমি ত বলিতে পারি। আমার সঙ্গে ত তাঁর কতকটা জানা শুনা আছে!”

পুত্র (উচ্চরবে)--“তা হবে না, তা হবে না, তাতে আরও অপমান”

পিতা। আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন করে বোল্‌বো যে, তাতে তোমার কিছুই অপমান হবে না. সাহেবকে খুসি করে ছেড়ে দিব।

রামচন্দ্র অস্ফুটস্বরে এই ভাবে বলিলেন, “কি অনুদারতা, সঙ্কীর্ণতা, পরমুখপ্রেক্ষিতা!”

নরহরির সঙ্গে ও-অঞ্চলের অনেক সাহেব-সুবোর আলাপ পরিচয় ছিল দরবারে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। নরহরি জমীদার,— নগদ টাকাও অনেক সাহেবেরা তাঁহার বড় খাতির করিতেন; তিনিও সাধ্যপক্ষে যথা-নিয়মে তাঁহাদের মন যোগাইতেন। ভারতীয় লোকের কষ্ট হইলে অথবা পৃথি

বীর অপর প্রদেশীয় কোন জাতির দুর্গতি ঘটিলে, সাহেবগণের চোখ দিয়া যখন জল পড়িত, তখন দপ্তরী-সম্প্রদায় চাঁদার খাতা তৈয়ারি করিতে ব্রিত থাকিত। খাতা প্রস্তুত হইলে, স্থানীয় সাহেব সর্ব্ব অগ্রে, সম্মান-পুরঃসর তাহা নরহরির নিকট পাঠাইয়া এইরূপ পত্র লিখিতেন, "মাই ডিয়ার নরহরি! আপনি আদর্শ জমীদার, আপনার দস্তখত দেখিয়া, সকলে দস্তখত করিবে, তাই প্রথমেই আপনার কাছে খাতা পাঠান হইল।" নরহরি ভাবিতেন, "ইংরেজরাজ্যে বাস করিতে হইলেই, সময়ে সময়ে এইরূপ টেক্স দিতেই হইবে, সংসারধর্ম্মের ইহা এক রকম নিত্যনৈমিত্তিক খরচ।" সুতরাং তিনি তাহাতে অকাতরে সই করিতেন। দুই শত টাকার কম তাঁহার দস্তখত ছিল না। সাহেবগণ এই নিমিত্ত তাঁহার উপর বড়ই সদয় ছিলেন এবং এই অনুগ্রহের ফলস্বরূপ তিনিও শেষে রায়বাহাদুর উপাধি পান। বলা বাহুল্য, মূর্খ-নরহরির চেষ্টায় পণ্ডিত-রামচন্দ্র অবশেষে ডেপুটী মাজিষ্টর হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্র ডেপুটী হইয়া প্রথম চারি বৎসর কাল বনে বনে ভ্রমণ করিলেন। কখন জলপাইগুড়ি, কখন রাঁচি, কখন বালেশ্বর—বন-জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত, নদনদী কিছুই তিনি বাকি রাখিলেন না। ডেপুটী বাবু যেন চরকী কলে ঘুরিতে লাগিলেন। পিতা নরহরির মন, ইহাতে শান্তি লাভ করিল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন; এ কি রকম চাকুরি হইল? ছেলে যে এক স্থানে সুস্থির হইয়া বসিতে পায় না। কিন্তু ছেলে ওদিকে নিজগুণে সময়ের কেবল সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি যেমন কেন অনুর্ব্বরক্ষেত্রে পতিত হউন না, তাঁহার শুভাগমনে, সে দেশ অমনি ফলফুলে সুশোভিত হইত। তথায় যাইয়া সর্ব্বাগ্রে একটী বালিকাবিদ্যালয় খুলিতেন; এবং তাঁহার সম্পাদকীয় গুরুভার নিজ কোমল কাঁধে গ্রহণ করিতেন। একটী সভাও স্থাপিত হইত। সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, এখানে রাজনীতি এবং ধর্ম্ম বিষয়ে কোন বক্তৃতা হইবে না। সেই সভার সর্ব্বঅধিবেশনেই তিনি স্বয়ং সভাপতি-রূপে বরিত হইতেন। তথায় স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-অধিকার স্ত্রী-স্বাধীনতা, মদ্যপান, ভ্রাতৃভাব, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়িণী বক্তৃতা হইত। বস্তুত, সে মরুময় দেশে তাঁহার অনুগ্রহ দৃষ্টিতে আশাবৈতরণী নদীর-স্রোত বহিত, শুকান কাঠ মঞ্জরিত, বন্ধ্যা গাছে ফল ধরিত,—দেশ উন্নতির চরম মার্গে উঠিত।

মধ্যে মধ্যে রামচন্দ্র পিতাকে পত্র লিখিতেন, আমার এ উচ্চপদে প্রকৃত অনুষ্ঠানের সহিত থাকিতে হইলে, মাসিক দুই শত টাকায় কুলায় না। নরহরি বিব্রত হইলেন। যে সাহেবকে ধরিয়া পুত্রের ডেপুটীপদ-প্রাপ্তি হইয়াছিল, আবার তিনি সেই সাহেবকে গিয়া ধরিলেন। পুত্রের কিছু বেতন বৃদ্ধি এবং একটী ভাল যায়গায় বদলী করা, সাহেবের নিকট নরহরির এই দুই প্রার্থনা ছিল। নরহরির নামাগুণে সাহেব চিরবশীভূত ছিলেন। প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর হইল। কিন্তু সাহেব শেষে বলিয়া দিলেন, "তোমার ছেলেকে সাবধানে কাজ কর্ম্ম করিতে বলিবে; এবং

মধ্যে মধ্যে আমার সহিত দেখা করিতে বলিবে। ছয়মাস মধ্যে বেতন বাড়িবে?”

পণ্ডিত-রামচন্দ্র, মূর্খ-পিতার চেষ্টায় হুগলীতে বদলি হইলেন। পাঁচ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর রামচন্দ্র যেন স্বদেশে আসিলেন। খনির তিমির-গর্ভ হইতে রত্নখানি পৃথিবীর উপরে উঠিয়া যেন হাসিতে লাগিল; সমুদ্রমন্থনে যেন উচ্চৈশ্রবা ঘোঁড়া, নিবিড় পাতাল প্রদেশ হইতে ধরাধামে উত্থিত হইল; অথবা গোপিনীমনোমোহন, রাধাবিনোদন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যেন বিষময় পাঁকময় কালীয় হৃদ হইতে, কালীয় দমনপূর্ব্বক পাড়ে উঠিলেন; অথবা যেন মহাকবি দ্বৈপায়ন, কুজ্ঝটিকার অন্তরালে জন্ম গ্রহণ করিয়া, রোদ উঠিলে; লোক-সমাজে দেখা দিলেন; অথবা পৃথিবীপতি রাজা দুর্য্যোধন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে হৃদ মধ্যে লুকাইবার পর, ভীমের বাক্যে আবার যেন ডাঙ্গায় উঠিয়া গা ঝাড়িলেন;—(আপনারা সকলে অনুমতি করেন ত, এইরূপ খানিক বর্ণন করিয়া যাই। আমার মন-টিয়া-পাখী ডাকিয়া উঠিয়াছে। আঙ্গুলের ডগ সুড়সুড় করিতেছে। কলমরূপ মহা অশ্বের লাগাম টানিয়া রাখিতে পারিতেছি না—কুপথ বিপথ ভেদ করিয়া, পাহাড় জঙ্গলের উপর দিয়া, নদ নদী সাঁতার কাটিয়া, তেজস্বী কলম-ঘোঁড়া কোন্ স্বর্গপানে ছুটিয়াছে, তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। এমন সুবিধা; এমন আসর আর পাইব না। এই ক্ষেত্রেই আমি মহা-ঔপন্যাসিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব—একবার অনুমতি দিন।—না দেন, নাই বা দিলেন, জগৎ অদ্য এক মহাকৌস্তুভমণি হারাইল, তাতে আমার ক্ষতি কি?)

রামচন্দ্র হুগলীতে আসিয়া বলিলেন, এইবার নিজের এলিমেণ্টে আসিলাম, উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত স্থানই পাইলেন! এইবার কর্ম্মক্ষেত্রের অধিক প্রসর পাইব। দেশের উন্নতি করিয়া এইবার মনের সুখ হইবে। এত দিন কেবল কাদা ঘেঁটে বেড়াইতেছিলাম, মাছ ধরিতে পারি নাই।

রামচন্দ্র, গঙ্গার ধারে আকালো-গোছ বাসা ভাড়া লইলেন। মাতর্গঙ্গে! ঊনবিংশ শতাব্দীর “শিক্ষিত-লেখকগণ” তোমাকে কুলকুলনাদিনী বিশেষণে কেবল বিশেষিত করেন। মা! কুল-কুল-কুল-কুল রব ছাড়া

কি আর তোমার কোন গুণ নাই? তোমার গর্ভস্থ বড় লোকের বড় বাড়ীর বড় পোস্তায় থপাস্ থপাস্ শব্দে তরঙ্গঘাত ছাড়া কি তোমার কোন কাজ নাই? বাইজী লইয়া, বন্ধু লইয়া, মদ লইয়া, মাংস লইয়া তোমার বক্ষে বৈকালে সখের পান্‌সী ভাসানো ভিন্ন কি বাবুগণ আর কোন আমোদ পান না? শৈলসুতে, ধূর্জ্জটীজটাবিভূষিতে, জহ্নুকন্যে, প্রসন্নপুণ্যসলিলে, ঈশ্বরি!—আমি মূঢ়মতি, মূর্খ, অকিঞ্চন,—তোমার মহিমা আমি কি বুঝিব? কিন্তু শিক্ষিত ডেপুটী-রামচন্দ্র, বন্ধুগণকে বলিতেন—'গাঞ্জেস্ বড়ই বাহারে নদী, জলস্রোতের শব্দটীও বেশ, জ্যোৎস্না রাত্রে নৌকা করে বেড়াতেও খুব মজা।" বন্ধুগণ অবশ্যই একবাক্যে উত্তর করিতেন,—"অতি ঠিক্ কথা! কিছু পয়সা না থাকিলে, গঙ্গার ধারে এরূপ বাড়ী লওয়া বৃথা। আপনার মত লোকের পক্ষেই এরূপ অট্টালিকা এবং গঙ্গা একমাত্র উপযুক্ত। শুনিয়াছি, বিলাতে টেম্‌স্ নদী অপেক্ষাও গঙ্গানদী ভাল!"

রামচন্দ্র। তাও কি কখন হয়? ইণ্ডিয়ার নদীর সঙ্গে কখন কি ইংলণ্ডের নদীর তুলনা সম্ভবে? আহা! টেম্‌সের কি অনির্ব্বচনীয় ভাব! উপরে কত শত পুল, নীচে রেলপথ! অমন নদী কি আর জন্মে?

তখন অধিকাংশ বন্ধু, তাঁহার মতে মত দিয়া বলিত, "তা ত হবেই এদেশী নদীগুলো কি আর নদী? না আছে এক খানা পারাপারের ষ্টীমার না আছে একটা পুল! (বঙ্গে, ভাগীরথীতে তখন কোন রকম পুলই হয় নাই।) বর্ষাকালে গঙ্গার জল এত ঘোলা হয় যে, মুখে করে কার সাধ্য? শীতকালে জলটা বরফের মত এত ঠাণ্ডা যে, স্নানের সময় ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতে হয়! গঙ্গাজলে সুখটা কি, এবং ওতে আছেই বা কি? মড়া ভাসে—কুকুর শেয়াল গরু মরে ভেসে যায়, মড়া পোড়ান ছাইগুলো যেয়ে জলে মেশে, আর সহরের যত ময়লা সবই ঐ জলে! ছি! ও-জল কি খেতে আছে, না উহাতে স্নান করিতে আছে?"

রামচন্দ্র। তা বটে। তবে কি না, এক জায়গায় অনেকটা জল সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়? ইহাই পরম লাভ।

বন্ধু। হায়, হায়, হায়! আপনি বুঝি মনে করেছেন, বার মাসই গঙ্গার

জল আপনার ঐ পোস্তায় এসে গালবে? এ ভাদ্দর মাস, ভরা গাঙ, তাই এখন আপনার বারান্দার গায়ে জল!—এর পর, কোথায় বা জল, আর কোথায় বা আপনার বারেন্দা!—চৈত্র মাসে গঙ্গাটী ঠিক্ একটী হাড়গোড় ভাঙ্গা দ হয়ে উঠবে,—দেখ্‌লে আপনার ঘৃণা হবে।

রামচন্দ্র।. বলেন কি? বার মাস এমন ভাবে কি জল থাকবে না?

বন্ধু। আরে রাম! গঙ্গা আর ক দিন? হুগলী কালেজের সম্মুখে একটা চড়া পড়েছে, দেখেন নাই? গঙ্গা আর ২৫ বছর বৈ ত নয়?

হুগলী আসিয়া, প্রতিবেশী বন্ধুবর্গের সহিত আলাপে, কয়েক দিনের মধ্যেই রামচন্দ্র গঙ্গামাহাত্ম্য বিলক্ষণ বুঝিয়া লইলেন। তবে কি না, তিনি নিতান্ত পরোপকারী এবং দয়াল, তাই অনুগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের মহা ধুম। জলে স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রই কেশব বাবুর নাম। ঘরে, বাহিরে, হাটে, মাঠে, রেলগাড়ীতে, বিয়েবাড়ীতে—যেখানে যাই, সেইখানেই কেশব বাবুর কথা! কালী, দুর্গা কিছু নয়; শিব কৃষ্ণ কেহ নয়; দুর্গোৎসবটা কুসংস্কার; কালীপূজাটা পৈশাচিক প্রক্রিয়া; শ্রীকৃষ্ণ ননিচোরা—গোপিনী-কুল-ললনার কুল-কলঙ্ক!—চারিদিকে ইত্যাকার ধ্বনি উঠিল। বিবাহের মন্ত্র নাই, বামুনদের কেবল ওটা বুজরুকি!—আইনমত রেজেষ্টরী না হইলে, বিবাহ পাকা হয় না। পৈতাগাছটা, মানবদেহের ভারমাত্র! গাছে তুলা হয়, সেই তুলা পিঁজে সূতা হয়, সেই সূতাসমষ্টি একত্র করে, পাক দিয়া পৈতা হয়—সে পৈতার আবার মাহাত্ম্য কি? নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণগণ সেই দড়াগাছটা—এক তিল বিশ্রাম নাই; দিন রাতই গলায় দিয়া রাখে! ব্রাহ্মণের এই চির-গলায়-দড়া, কেবল এই অসভ্য কুসংস্কারাপন্ন ভারতেই সম্ভবে! অতএব, ফেলো পৈতা! শালগ্রাম-বিগ্রহগুলি, ভাদ্রমাসের একটানা গাঙে, ভাটার সময় ফেলিয়া দাও,—যেন বঙ্গোপসাগর পার হইয়া, গড়াইতে গড়াইতে সেগুলি মাদাগাস্কার দ্বীপে গিয়া ঠেকে! জাতি-ভেদ বন্ধ হইয়া যাক্। হাড়ী, ডোম, চণ্ডালের সহিত ব্রাহ্মণের পার্থক্য না থাকে। যার যাকে ইচ্ছা, সে তাকে বিবাহ করুক—উচ্চ নীচ ভেদ নাই। যার যেরূপ ইচ্ছা, সে সেইরূপ পরের উচ্ছিষ্ট খাউক—মুসলমান, ম্লেচ্ছ, মুদ্দফরাস বিচার নাই। জলচর, স্থলচর, উভচর, খেচর—চরাচরে যত প্রকার জীব আছে, সমস্তই মনুষ্যের আহার্য্য। এটা খেতে আছে, ওটা খেতে নাই, ইহাকে বিবাহ করিতে আছে, উহাকে বিবাহ করিতে নাই,—হিন্দুগণের এইরূপ কুসংস্কারেই ভারত মাটী হইয়াছে! রেল-ওয়ে-কেরাণিগণ, এইবার আশা করিল, কেশব বাবুর নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে, ভারত নিশ্চয় উদ্ধার হইবে। অনেক স্কুলের বালক আশা করিল, মুসলমানের দোকানের পাঁউরুটী আর লুকাইয়া কিনিতে হইবে না। কোন কোন কুলমহিলা আশায় বুক বাঁধিলেন, এইবার তাঁহারা প্রকাশ্যে

ফাউলকারী র াঁধিবেন। অধিকাংশ নীতিজ্ঞ রৌচিক পুরুষ বুঝিলেন, এইবার স্ত্রীজাতির উন্নতি বা উৰ্দ্ধগতি হইবে, গৃহস্থের মেয়ে স্বাধীনতা পাইবে, বেশ্যার দমন হইবে।

ডেপুটী রামচন্দ্র এ সুযোগ ছাড়িলেন না। কেশব বাবুর নামে স্বতই তাঁহার হৃদয় গলিতে লাগিল। তিনি সকলের সম্মুখে বলিতেন, "আহা! অমন লোক আর হবেনা, তিনি মহাপুরুষ! কর্ত্তা ঈশ্বরের অবতার!" প্রতি শনিবার কাছারির কার্য্যশেষে রামচন্দ্র কলিকাতায় কেশব বাবুর নিকট গমন করিতেন। সমস্ত রবিবার কেশব বাবুর সঙ্গে উপাসনাদি করিয়া, সোমবারে কাছারির সময় হুগলী পৌঁছিতেন। এইরূপ কয়েক মাস কলিকাতা আনাগোনা করিয়া রামচন্দ্র কেশব বাবুর ধর্ম্মের সারভাগটুকু ছাঁকিয়া বাহির করিয়া লইলেন। প্রকৃতপক্ষে রামচন্দ্র একটি ধর্ম্ম-হাঁস। তরঙ্গ-বিক্ষোভিত, অগাধ ধর্ম্ম-দুগ্ধের আটলাণ্টিক-ওসেন হইতে তিনি সকল ক্ষীরটকুই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিক আর কি বলিব, বঙ্গের মহাকবি হেম বাবুর মত, তিনি ধর্ম্ম-নবনীর সরটুকুও আত-মিহি ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া লইলেন। সেই সারের সার, অতি-সার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, রামচন্দ্র অনন্যমনে, হুগলিতে তাহার প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন—ধর্ম্ম-সৌরভে হুগলী আমোদিতা হইল। সেই কুল-কুল-নাদ-বিশেষণে বিশেষিতা গঙ্গানদী সেই অতি-সার ধর্ম্মের সুগন্ধ ভাসাইয়া জলপথে দিগ্‌দিগন্তে লইয়া গেল; জগৎ-প্রাণ অনিল, ব্যোমপথে সেই মহাগন্ধ, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামনিচয়ে পৌঁছাইয়া দিল; আর স্বয়ং রামচন্দ্র, স্থলপথে প্রতিবেশীমণ্ডলীর ঘরে ঘরে তাহা বহন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ডেপুটী বাবু আজ নেহাইত নূতন ব্রাহ্ম নহেন। অনেকদিন হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের গন্ধটুকু তাঁহার নাকে গিয়াছিল। কলিকাতায় পঠদ্দশায় যখন তাঁহার "রামদাস" নাম ছিল, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে অতর্কিত ভাবে, এক আধটা সমাজে যাতায়াত করিতেন। চোখ বুজিবার সময় চোখ বুজিতেন, কিন্তু কেবল আঁধার দেখিতেন! সুখ বা মজা কিছুই পাইতেন না। তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের তত রগড় উঠে নাই; ধুমধামও থাকে নাই। ধর্ম্মের প্রাণ যে বক্তৃতা, গান, বাজনা, মেয়েমানুষ,—তখন সুব্যক্ত ভাবে এসব কিছুই ছিল না। ছিল কেবল, স্তিমিত নয়নযুগ্ম; কাজেই তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাল লাগে নাই। নিমিষ চোখবুজিয়া, বিরক্ত হইয়া, কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি এ ধর্ম্মব্রত ত্যাগ করিলেন! ছাড়িলেন বটে, কিন্তু ঝোঁক একটু যেন রহিল। ব্রাহ্মধর্ম্মই হউক, বা কোন নবীনা রমণী হউক,—কাহারও সহিত গুপ্তপ্রণয় আলাপ করিতে গিয়া, বিফলমনোরথ হইলেই যে, হঠাৎ পূর্ব্ব আসক্তি একেবারে লোপ হয়, তা নয়। রামচন্দ্র ডেপুটীপদ পাইলেও, ব্রাহ্মস্মৃতি-মধু তাঁহার হৃদয়-কমলে সঞ্চিত ছিল। কোন মজলিসে, বৈঠকে, বা খোষআলাপে ব্রাহ্মকথা উত্থিত হইলে, তিনি তৎসম্বন্ধে দুটা কথা গাহিয়া দিতেন। কখন বা প্রভাতকালে, নির্জ্জনে, আপন মনে এই মধুর-রসাত্মক, সুললিত ব্রাহ্মগীতিটী গাহিতেন;—

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কত আর নিদ্রা যাও ভারত সন্ততিগণ।
নয়ন খুলিয়া দেখ, শুভ উষা আগমন।
অধীনতা অন্ধকার, পাপ তাপ দুর্নিবার,
মঙ্গল জলধি জলে হতেছে চির মগন।
সযতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃ সমীরণ স্বরে,
ডাকেন ভারত-মাতা পরি উজ্জ্বল বসন;
উঠ বৎস প্রাণসম, যত পুত্র কন্যা মম,
কাল রাত্রি অবসানে উদিল সুখ-তপন।

বিশাল বিশ্ব-মন্দিরে, সত্য-শাস্ত্র শিরে ধ'রে,
বিশ্বাসেরে সার করে, কর প্রীতির সাধন;
নর নারী সমুদয়ে, এক পরিবার হয়ে,
গলবস্ত্রে পূজ তাঁরে, যা হতে পেলে এদিন॥

কিন্তু হুগলী আসার পরই ফুল ফুটিল। এই সময় রামচন্দ্রের হঠাৎ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। কলেবরটী, কে যেন নূতন করিয়া গড়িয়া দিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি উচ্চবংশ, উচ্চজাতি এবং উচ্চপদের অহঙ্কার করিতেন; বলিতেন, ব্রাহ্মণের মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রধান কুলীন; 'বেঙ্গল-আরিষ্টক্রাশীর' মধ্যে তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম,—কৃষ্ণনগরের রাজগণ টাকা কর্জ্জের জন্য সদা তাঁহাদের দ্বারস্থ থাকিতেন; এবং তাঁহার বর্ত্তমান পদটা যে সর্ব্বোচ্চ, তাহা ত ডেপুটী নামেই প্রকাশ। এই ত্রি-কারণনিবন্ধন তিনি সকল সময় সকলের সহিত কথা কহিতেন না, সকল সময় সকলকে চিনিতে পারিতেন না, সকল সময় সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিতেন না। তাঁহার গৃহের বৈঠকখানায় এক আসনেই তিন রকম ভাঁজ ছিল। প্রথমে মেজের উপর মাদুর পাতা; তার উপর সতরঞ্চ; সতরঞ্চটী, মাদুর অপেক্ষা কিছু ছোট; সুতরাং খানিকটা মাদুর বাহির হইয়া থাকিত। যত বাজে লোক সেই বহিঃস্থ মাদুরে বসিত; সতরঞ্চের উপর সাদা ধপধপে একখানি লঙক্লথের চাদর—চাদরটী আকৃতিতে সতরঞ্চের ছোট। আর ঐ চাদরের উপর সাটিনের একটী শয্যা। তাহার দৈর্ঘ্য ৩।০ হাত, প্রশস্ততা ২ হাত। উহাই ডেপুটী বাবুর বসিবার খাস আসন।

কিন্তু আজকাল ডেপুটীবাবুর সে ভোল আর নাই। অসভ্য পূর্ব্বপুরুষের সেই বনিয়াদি গাদিয়ানি বিছানার পরিবর্ত্তে, এখন তাঁহার বৈঠকখানা টেবিল, চেয়ার, কোচে পূর্ণ। তামাক খাইবার সটকা ও হুঁকার বদলে চুরাট, পাইপ আধষ্ঠিত। অধিক কি, ডেপুটী বাবুর নিজ সাজসজ্জারও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। সে রেলপেড়ে ধুতি, সে শান্তিপুরে চাদর আর নাই। এখন ঘরে আটপৌরে পরেন—ঢিলে ইজার, আর ফুলো কামিজ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার জ্ঞানের অধিক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল। কোন ভদ্র লোক নিকটে আসিলে, ইতিপূর্ব্বে তিনি নিজ মান-হানি আশঙ্কায়, তাঁহার সহিত হঠাৎ

কথা কহিতেন না; আজ তিনি কিন্তু দূরে অদূরে লোক দেখিলেই যাচিয়া যাচিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। যেমন কেন লোক হউক না, তাঁহার বাসায় গেলেই, তাহাকে "আসুন, আসুন, বসিতে আজ্ঞা হউক"—ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। সদাই তিনি মুখে এইরূপ বুলি ধরিলেন,—"সাম্য, সাম্য, সাম্য,—ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ সব সমান,—পরমপিতা পক্ষপাতী নহেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ করিয়াছেন—সকলেই এক,"—

এই সময় একদিন গার্হস্থ্য নাপিত বাবুকে কামাইতে আসিল। বাবু অমনি তাহাকে আস্তে ব্যস্তে "আসুন আসুন, আপনি এই দিকে বসুন" ইত্যাদি কথা বলিয়াই, নিজ পার্শ্বস্থ চেয়ারখানি সরাইয়া দিলেন। তারপর,—"ক্ষুরাদি এই টেবিলের উপর রাখুন,—অনেক পথ চলিয়া আসিয়াছেন, একটু সুস্থির হউন, খানিক বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তি দূর করুন"—নাপিতের উপর বাবুর মধুর সম্ভাষণ-রূপিনী এইরূপ বক্তৃতা একটানাই চলিতে লাগিল। নাপিত ত অবাক্। সে দুইমাস ছুটী লইয়া বাড়ী গিয়াছিল। দুই মাস মধ্যে ডেপুটীবাবুর হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া, সে যেন একেবারে হতবুদ্ধি হইল। পরিবর্ত্তন কি একটা? বাবুর বিছানায়, পোষাকে, চেহারায়, জ্ঞানে—সর্ব্বত্রই বিসদৃশ ভাব! পরামাণিক পূর্ণমাত্রায় বিস্মিত এবং কতকটা ভীত হইয়া যোড়হাতে বলিল, "আমি গরীব, আপনার দোয়ারে দুটী অন্ন করে খাই—চাকরকে মাপ করবেন"—

ডেপুটীবাবু। চাকর কি? এ সংসারে চাকর কে কার? আমরা সকলেই সেই এক নিরাকার ঈশ্বরের সন্তান—আত্মপর কোন ভেদ নাই—সকলেই সহোদর ভাই—তোমাতে আমাতে কোন উচ্চনীচ সম্বন্ধ নাই—তুমি যদি আমাকে চাকর বল, তাহ'লে আমিও তোমার চাকর—এস ভাই তোমাকে একবার ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করি।—"

নাপিত। বলেন্ কি, হুজুর!—আপনি মা বাপ, আপনি এমন কথা বল্লে আমি যাবো কোথা—আপনি অমায় ক্ষমা করে, পায়ের ধূলা দিন—নইলে আমি পাপে পচে মর্‌বো—

তখন নাপিত, সেই ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ডেপুটীবাবুর পায়ের ধূলা লইতে উদ্যত হইল।

বাবু। করো কি, করো কি? আমি কিসে তোমার চেয়ে বড়? কখনই না। তুমি আম-র ধর্ম্মনষ্ট করিও না। আমার সমস্তই সমভাব; সমস্তই ভ্রাতৃভাব। তুমি আগে আমায় পায়ের ধূলা দাও, তার পর তোমায় আমি পায়ের ধূলা দিতে পারি।

নাপিত ভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়া জিহ্বা কাটিল,—মুখে বলিল,—শ্রীহরি! শ্রীহরি! মধুসূদন, মধুসূদন!"

নাপিত তথাচ থামিল না। সে, ব্রাহ্মণডেপুটীবাবুর পদধূলি লইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাবু সবেগে চেয়ার হইতে উঠিয়া নাপিতের হাত ধরিয়া বলিলেন,—ক্ষান্ত হও, এস, এস, বঁধু এস, একবার ভ্রাতৃ-ভাবে সমানে সমানে প্রেমালিঙ্গন করি—

নাপিত তখন "গেলাম, মোলাম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। এবং ভয়ে বিহ্বল হইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে প্রকৃতই ভূতলে পড়িয়া গেল। মহাহুলস্থূলকাণ্ড। বাবুর পুরাণ ভৃত্যটী দৌড়িয়া আসিল। খানসামাটী জাতিতে সৎগোপ,—এবং বহুকাল ধরিয়া ঐ সংসারের চাকর। পুত্র-রামচন্দ্র যখন ডেপুটীপদ পাইয়া, দেশবিদেশ ভ্রমণে নিযুক্ত হইলেন, তখন পিতা-নরহরি ঐ বিশ্বাসী কার্য্যদক্ষ ভৃত্যটীকে রামচন্দ্রের সঙ্গে দেন। খানসামা হরিভক্ত লোক; তিলক কাটে, নামাবলী গায়ে দেয়, সদা হরিবোল হরিবোল করে। এ দোষ তার পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। বাবু কিন্তু আজকাল খানসামাকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—"তুমি নাকে ঐ সাদা পদার্থ মাখ কেন? মাথার মধ্যস্থলে, সমগ্র চুল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ লম্বা একগোছা চুল রাখ কেন?—ছি! উগুলা বড়ই অসভ্যতার চিহ্ন।" প্রবীণ ভৃত্য প্রথম প্রথম বাবুর এ সব কথায় কাণ দিত না,—শেষে বাড়াবাড়ি দেখিয়া, মনে ভাবিল, বাবুর কোন একটা আন্তরিক রোগ জন্মিয়া থাকিবে। অদ্য এই নাপিত-ঘটিত ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে বলিল—"ওঃ—আজ বুঝি সেই রোগটা অধিক মাত্রায় চাগাড় দিয়াছে!—ক্রমে হলো কি? কর্ত্তা মোশাইকে, দেশে, এ কথা না বলে পাঠালেত আর চলে না"—প্রকাশ্যে বলিল,—"বাবু, বাবু, কি হয়েছে, আপনি অমন করিতেছেন কেন?"—

খানসামাকে দেখিয়া নাপিত একটু সাহস পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং

কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমায় তুমি রক্ষা কর।"

বাবুও তখন গতিক বড় সুবিধা নয় দেখিয়া, চেয়ারে গিয়া বসিয়া বিশ্রাম সুখলাভ করিতে লাগিলেন। নাপিত ইত্যবসরে, বাবুকে দূরে দেখিয়া, "দোহাই ধর্ম্ম, আমি কোন পাপের পাপী নহি" বলিয়া, ভাঁড় ফেলিয়া, বেগে, লম্বা-লম্ফে তথা হইতে পলাইল। শুনা যায়, নাপিত, ভাটপাড়া হইতে বিধান আনিয়া, নিজপাপের প্রয়িশ্চিত্ত করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতে সে আর ডেপুটীবাবুর বাসার ত্রিসীমানায় পদার্পণ করে নাই। তাহার আরও একটা বাতিক জন্মিল,—ভাল ব্রাহ্মণপণ্ডিত দেখিলেই সে এই কথা জিজ্ঞাসিত,—"কোন ব্রাহ্মণ আমার পায়ের ধূলা নিতে এসেছিলেন। তা আমি প্রায়শ্চিত্ত করেছি, দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ-ভোজনও করিয়েছি—গরীব মানুষ কোথা কি পাবো,—এতে আমার পাপ ক্ষয়ানত হয়েছেত ?"

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিন্তা-মগ্ন হইল—বাবুর খানসামা। রোগ নিরাকরণের জন্য সে, তার পরদিনই লুকাইয়া কাঁচড়াপাড়ায় বৈদ্যবাড়ী গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ইত্যবসরে এক মহাসুবিধা ঘটিয়া গেল। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকর্ম্মের প্রধান শত্রু ছিল, সে নিপাত হইল। যে অশিক্ষিত, অসভ্য, বর্ব্বর, বৃদ্ধ ব্যক্তি এত দিন ডেপুটীবাবুর পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, পিতাকুলে কেবল কলঙ্ক লেপিতেছিল,—সেই নরহরে—সেই বুড়ো বাপ্ ব্যাটা—হঠাৎ মরিয়া গেল। কণ্টক ঘুচিল। আপদ বালাই দূর হইল।

ব্রাহ্মধর্ম্মটা স্বর্গে উঠিবার পাকা সিঁড়ি। ডেপুটী বাবু যেমন সেই সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দেন, অমনি সেই বুড়ো বাপটা ঠিক্ খেঁকি কুকুরের মত খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করিয়া বাবুকে কামড়াইতে আসিয়াছিল। কিন্তু পশুরাজ সিংহ, দুর্ব্বল কুকুরের কথা শুনিবেন কেন? সুতরাং পিতার নিষেধ সত্ত্বেও কেবল নিজগুণে, রামচন্দ্র সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়া দাঁড়াইলেন। আবার যেমন তিনি দ্বিতীয় ধাপে উঠিবার উপক্রম করিলেন, সেই কুকুররূপী বাপ্‌টাও আবার খ্যাঁক খ্যাঁক আরম্ভ করিল।

পিতাকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা, আমাদের নিজের নহে। একদিন ডেপুটী-বাবু, তাঁহার গুরুদেবকে বলিয়াছিলেন, "বাপ্‌তো আমায় হাড় জ্বালাইল, বিরক্ত করিয়া মারিল।" গুরুজী উত্তর দিলেন, "Let the dog bark" অর্থাৎ "কুকুরকে খেউ খেউ করিতে দাও।"

কিন্তু অদ্য সেই নিরাকার ঈশ্বরের রাঙাপদের কৃপায়, শীঘ্রই ডেপুটীবাবুর অস্থি-যন্ত্রণা দূর হইল। চারিদিকে শান্তি, শান্তি, শান্তি! সুপ্রভাত, সুপ্রভাত, সুপ্রভাত! পিতার মৃত্যুসংবাদে তিনি প্রকৃতই হাতে হাতে স্বর্গ পাইলেন! যেদিন প্রাতে তিনি পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইলেন, সেইদিন তৎক্ষণাৎ কলিকাতাবাসী গুরুজীকে এইরূপ পত্র লিখিলেন,—"আর ভয় নাই। ঈশ্বর আমাদের সহায়। ধর্ম্মপথের কণ্টক ঘুচিয়াছে। যাহার জন্য এত দিন আমি হাড়েহাড়ে জ্বলিতেছিলাম, জীবন্মৃত্যুবৎ ছিলাম, পরমব্রহ্মের করুণাকটাক্ষে, এত দিনে সে ব্যক্তি পরলোক গমন করিয়াছে। বিগত বুধবার জ্বররোগে নরহরির মৃত্যু হইয়াছে। পিতাটা অতিশয় পাপী ছিল।—তাহার উদ্ধারের জন্য অনুতাপ আবশ্যক। কবে অনুতাপ করিতে হইবে,

দিন স্থির করিয়া লিখিলেই, কলিকাতা গিয়া আপনার সহিত একত্র অনুতাপ করিব।”

সপ্তাহকাল মধ্যে চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, রামচন্দ্রের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু কুসংস্কারাপন্ন হিন্দুর ন্যায় তিনি কাচা গলায় দিলেন না, খালি পায়ে বেড়াইলেন না, একবেলা হবিষ্যান্নও খাইলেন না;—কেবল সভ্যসমাজ-অনুমোদিত সুপ্রথা অবলম্বন করিলেন। একমাসকাল কালো কাপড় সর্ব্বদা পরিয়া রহিলেন, এবং কালো কোটের উপর এক কালোরঙের ফিতা বসাইয়া দিলেন। উচ্চ-হৃদয়ের কি অপূর্ব্ব ভাব! পিতৃ-বিয়োগ-জনিত একফোঁটা জলও একদিন তাঁহার চোখ দিয়া পড়িল না। প্রতিবেশী প্রিয়বন্ধুগণ পরস্পর বলাবলি করিল, “বাবুর মত এমন পবিত্র, স্বর্গীয় আত্মা ত কখনও দেখি নাই—পিতার মৃত্যু হইল, তথাচ তিনি একদিনও কাঁদিলেন না—তাঁহার চিত্ত কি মহান্!” নগেন নামক একটী ছোক্‌রা বি. এ, পাশ করিয়া হুগলী-কলেজে এম, এ, পড়িতেছিলেন,—তিনি সংস্কৃতে কবিতা আওড়াইয়া বলিলেন,—

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে।
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥

এ সংবাদে কাঁদিল কেবল, সেই পুরাণ পৈতৃক খানসামা। সে বেটা দিনে খায় না, রেতে ঘুমায় না, কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। খানসামা-চিত্তের এরূপ দৌর্ব্বল্য দেখিয়া, অনবরত ক্রন্দনধ্বনি -ঘ্যান ঘ্যানানি শুনিয়া, রামচন্দ্র বড়ই বিরক্ত হইলেন। তিনি ভৃত্যকে বলিলেন,—“তুমি একবার বাড়ী যাও, সেখানে গিয়া শুধরাওগে, শোকতাপ দূর করগে,—এখানে আর তোমার এখন থেকে কাজ নাই।” প্রভুর কথায় ভৃত্য কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় হইল।

এইবার রামচন্দ্র নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ, বাটী গিয়া কৃপণপিতার সিন্দুকে যে নগদ টাকার রাশি ছিল, তাহা হস্তগত করিলেন। গ্রামের লোক অনুমান করিত, বুড়ো নরচরির হাতে নগদ লক্ষ টাকার কম ছিল না। সে অনুমান সমূলক, কি অমূলক, তাহা রামচন্দ্রই জানিলেন,—আর জানিলেন, স্বয়ং অন্তর্যামী ভগবান।

মোদ্দা, বাটী আসিয়া, ডেপুটী বাবু অধিকতর হৃষ্টচিত্ত হইলেন। তাঁহার গণ্ডস্থল দুটা যেন ফুলিয়া উঠিল, ঈষৎ লালও হইল! কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি দেখিয়া গ্রামের লোক চমকিল।

বহুদিন পরে, ডেপুটীবাবু স্বদেশে, স্বগ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার গুরুদেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। গুরুকে দেখিয়া রামচন্দ্র প্রণাম করিলেন না। "আসুন বসুন"—এ কথা বলিয়াও তাঁহাকে তিনি সম্ভাষণ করিলেন না। পৈতৃক গুরু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া একদৃষ্টে শিষ্যের পানে চাহিয়া রহিলেন। যে গুরুদেবকে দূরে দেখিলেই, বৃদ্ধ নরহরি সসম্ভ্রমে উঠিয়া, অগ্রগামী হইয়া, ধূলাতেই গড়াগড়ি দিয়া, প্রণাম করিতেন, পদধূলি লইয়া আপন মাথায় দিতেন, সেই গুরুদেব আজ পুত্র-রামচন্দ্রের নিকট খাড়াভাবে দণ্ডায়মান—সম্মান গৌরব, ভক্তি, প্রণাম করিবার কেহই নাই। গুরুদেব ঈষৎ লজ্জিত, চকিত এবং ভীত হইলেন। কোথায় যাই, কোথায় বসি, কি করি, কাহাকে বলি, এই ভাবনাতেই তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। শেষে রামচন্দ্রের চক্ষু-যুগলে চসমা সুশোভিত দেখিয়া, গুরু স্থির করিলেন, রামের বুঝি কোন চক্ষুদোষ জন্মিয়া থাকিবে, বুঝি লোক ঠাওরাইতে তাহার কষ্ট হয়,—তাই রাম আমাকে চিনিতে না পারিয়াই, সম্ভাষণ করে নাই। তখন গুরু প্রকাশ্যে রামকে বলিলেন, "রাম তুমি আমায় ঠাওরাইতে পার নাই কি? শারীরিক কুশল ত?"

রামচন্দ্র অতি মিহিসুরে (যেন কতকাল খান নাই) ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন, "কে তুমি? তোমার নাম কি? বাড়ী কোথায়? একি!! তোমার গলদেশে সাদা সূত্র কয়েক গাছি ঝোলান কেন? গলরজ্জু দেখিয়া আমার অন্তর কাঁদিতেছে। তুমি কি রাজদণ্ডে দণ্ডিত? তোমার উদ্ধারের নিমিত্ত আমি এখনি পরম পিতার নিকট অনুতাপ করিতে রাজি আছি।"

গুরু অবাক্, স্থিরদৃষ্টি।

পাড়ার একটা ধড়িবাজ লোক, বাবু গ্রামে আসা অবধি, বাবুর সঙ্গ লইয়াছিল। কয়েক দিন কেবল মিছিরির বুকনি দেওয়া, মাখমে পালিস করা, কথা কহিয়া, সে, বাবুর মন তুষ্টি করিতেছিল। গুরুর প্রতি ব্যবহার

দেখিয়া, সে লোকটা পর্য্যন্ত একটু লজ্জিত হইয়াছিল। সে বাবুকে বলিল—"মহাশয় যা আজ্ঞা কচ্চেন, সমস্তই ঠিক,—ইহা অতি সৎ কথা। কিন্তু উনি আপনার গুরুদেব, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন—"

রাম। গুরু কে? গুরুত আমার কলিকাতায়। তিনিই কি ছদ্মবেশে আমার জ্ঞানপরীক্ষার জন্য, পল্লীগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন?

সেই ধড়িবাজ লোকটার নাম নিতাইচরণ হাজরা—জাতিতে কায়স্থ। নিতাই বলিল, "হুজুর! ইনি আপনাদের পৈতৃক গুরু।"

রাম! ওঃ হোঃ—সেই ব্যক্তি! উহার সহিত আমার অনেক কথা আছে। উহাকে আপাতত কিছু ইংরেজী শেখানো দরকার। কুসংস্কার দূর হইলে, উহাকে কলিকাতা লইয়া গিয়া আমি, মুক্তি দিব। আজ ওকে তুমি যেতে বল—আমার সময় নাই; নচেৎ, অদ্য হইতেই ওকে এ, বি, সি, শিখাইতে আরম্ভ করিতাম।

গুরুদেব, রামের কথা শুনিয়া, বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেলেন! তাঁর মুখ দিয়া আর কথা সরিল না।

নিতাই গুরুকে বলিল, "ঠাকুর! আজ তুমি যাও,—এখন এখানে কিছু হবে না—হুগলীতে যেয়ে বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করো"—

রাম। নিতাই, তুমি ঠাকুর বলিলে কাকে? তুমি কি আজও ঠাকুর দেবতা মানো নাকি? ছি! পৌত্তলিকতা মহাপাপ!

নিতাই। আজ্ঞে—আজ্ঞে—ঠিক্ বলেছেন—আমি আর পুঁতুল পূজা করিব না—

গুরুদেব মনে মনে বলিলেন, "মনে করেছিলাম, কেবল রামই পাগল হয়েছে,—এখন দেখচি রাম একা নয়,—নিতাই শুদ্ধ বয়ে গেছে,—

এই বলিয়া গুরু অন্দরাভিমুখে মেয়েদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

রাম। (নিতাইকে)—"একি এ!—পুরুষ মানুষ, বাড়ীর মেয়েদের কাছে যায় যে! পাড়াগাঁয়ে এত উন্নতি হয়েছে নাকি? বেশ, বেশ!! বঙ্গের গৃহে গৃহে স্ত্রী স্বাধীনতা আবশ্যক। আমি মনে করেছিলাম, পিতার মৃত্যুর পর, পিসিমাকে হুগলীতে এনে, স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রদান করিব—কিন্তু

সেই ব্রহ্ম-কৃপায়, পিসিমা স্বয়ংই স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া—অকাতরে পর-পুরুষকে ঘরে প্রবেশ করিতে দিতেছেন! সাধু পিসিমা সাধু!

নিতাই। আজ্ঞে, সকলই সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ঘট্‌ছে—

রাম। ছি! ছি! ছি!—কেষ্ট কেহে? সেটা গয়লার বেটা—ননি-চোরা, কুরুচিপূর্ণ ছোঁড়া বৈত নয়! তাকে তুমি ঈশ্বর বলে সম্বোধন কত্তে লজ্জা বোধ কর না?—আমার সঙ্গে থাকা তোমার কর্ম্ম নয়—এখনও তোমার কুসংস্কার ঘুচিল না—

নিতাই। আজ্ঞে, মাপ করবেন্—আমি ভুলে বলেছি—

রাম। অমন জিহ্বা তুমি কেটে ফেল—এখনি আমার সাক্ষাতে কেটে ফেল।

তখন নিতাই অগত্যা দন্তদ্বারা, জিহ্বা কাটিয়া মা কালীবৎ রামচন্দ্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। রামচন্দ্র বলিলেন,—"এইবার তোমাকে শেষবার মাপ করিলাম; তুমি বল যে, নিরাকার ব্রহ্ম বৈ আমি আর কাহাকেও জানি না; তাঁরই চরণকৃপায় আমি বেঁচে আছি।" নিতাই কালীরূপ ছাড়িয়া বলিল, "নিরাকার ব্রহ্মের চরণকৃপায় আমি বেঁচে আছি।"

রাম। অতি উত্তম! অতি উত্তম!

ওদিকে গুরুদেব অন্দরে প্রবেশ করিলে, পিসিমা দৌড়াদৌড়ি আসিয়া গুরুর পাদপদ্মে প্রণিপাত হইলেন।

গুরু অতি-চিন্তামগ্ন ভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"মা, রামের ত অবস্থা খারাপ দেখিতেছি; তার মেজাজের ঠিক নাই বোধ হইতেছে।"

পিসিমা। আমিও ক দিন কেমন কেমন রামকে দেখিতেছি—"রাম আজিকাল যে সব কথা বলে, তাতে ঠিক মনে হয়, রামকে কেউ অষুদ করেছে।" এই কথা বলিতে বলিতে পিসির চোক দিয়া এক ফোঁটা জল পড়িল। ক্রমে রামবাবুর স্ত্রী, কন্যা পুত্রদ্বয় আসিয়া গুরুকে প্রণাম করিল। গুরুদেব সস্নেহে সকলকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন বাড়ীশুদ্ধ সকলেই রামচন্দ্রের কিসে মতিস্থির হয়, তদ্বিষয়ে গুরুদেবের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দশ দিন কাল, পল্লীগ্রামে বাস করিয়া, গ্রামবাসিগণকে নিজগুণের বিশেষ পরিচয় দিয়া, আবালবৃদ্ধবনিতাকে চমকিত করিয়া, রামচন্দ্র সপরিবারে হুগলীতে আসিলেন। এ পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের স্ত্রী, কন্যা বা পুত্রগণ সহর দেখেন নাই। তখন সেই নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতা স্ত্রীকে শিক্ষা দিতে রামচন্দ্র মনস্থ করিলেন। স্ত্রীটী প্রকৃতই লক্ষ্মীরূপিনী, পতিঅনুগামিনী, সতীসাধ্বী সহধর্ম্মিণী। পতি যা বলেন, স্ত্রী তাহাই প্রফুল্ল মনে করেন। কারণ স্ত্রী জানেন, পতি পরমগুরু। হিন্দু-রমণী জানেন,—

সকল তীর্থের ফল, ঘরে বসি করতল,
পতিপদে ভক্তিবল যার।
পৃথিবী পবিত্র যার, পায়ের ধূলায় আর,
কবি কি মহিমা কবে তার॥

হিন্দুরমণী আরও বুঝিয়াছেন;—

স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি,
স্বামী বনিতার বিধাতা।
স্বামীই পরম ধন, স্বামী বিনা অন্যজন,
কেহ নহে সুখমোক্ষদাতা॥

তবে স্ত্রীর একদোষ, তাঁহার বিষয়বুদ্ধি বড় কম। কেহ এক পয়সা ভিক্ষা করিতে আসিলে, তিনি হয়ত তাহাকে একটা আধুলি দিয়া বসেন। নিমন্ত্রণ করিয়া প্রতিবেশী মহিলাগণকে খাওয়াইতেছেন; পরিবেশনে তাদের পাতে তিনি সন্দেস ঢালিতেছেন ত ঢালিতেছেনই। পাড়ার যদি কোন স্ত্রীলোক কাঁদিল, তাঁর অমনি চোখে জল আসিল। কোন দুঃখিনী, যদি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "মা, আমার কাপড় নাই", তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ বস্ত্রখানি দিলেন; আবার তিনি ছেলেবেলা হইতেই বড় আদুরী; শ্বশুর শাশুড়ী লক্ষ্মীরূপিনী বলিয়া তাঁহাকে কিছুই বলিতেন না;—সকল সময়ই সকল আব্দার সহিতেন।

যে বৎসর তিনি স্বামীর ঘর করিতে প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসেন; সে বৎসর নরহরি অতি সামান্য পণে নিলামে দুই হাজার টাকা মুনফার এক সম্পত্তি কেনেন। তাই নরহরি সদাই বলিতেন; "মা আমার স্বয়ং লক্ষ্মী।"

সেই সতী সাধ্বী পতিব্রতার নাম অন্নপূর্ণা। কিন্তু কেবল সতীসাধ্বী হইলে কি হইবে? তাঁর যে দোষ ঢের। অন্নপূর্ণার সর্ব্বাঙ্গ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। নাকে তিলক, গলায় তিনকণ্ঠী তুলসীর মালা; হাতে শাখা; অধিক কি, সীঁথির অগ্রভাগে সুরকির গুঁড়াবৎ কি একটা লাল পদার্থ সদাই সন্নিবেশিত। অশিক্ষিতা স্ত্রীর এই সব ব্যাপার দেখিয়া; রামচন্দ্র বড়ই বিরক্ত হইলেন। ঘরে পেঁয়াজ আসলেই স্ত্রীটা নাকে কাপড় দেয়। বাজারের জল খাবার খায় না। মুসলমানের দোকানের পাঁউরুটী যে স্থানে থাকে; সে স্থানটায় গোবরজল ছড়া দেওয়া হয়। রামচন্দ্র নিজ অন্দরের সমাজ-সংস্করণে বড়ই অকৃতকার্য্য হইয়া পড়িলেন। বিপদ উদ্ধারের জন্য কলিকাতায় গুরুজীকে পত্র লিখিলেন। গুরুদেব সেই পত্রের এইরূপ উত্তর দিলেন,—"ভাই হে ভাবিও না। একটা বন্য ঘোড়াকে ব্রেক্ করিতে ছয় মাস লাগে, একটা বন্য মানুষীকে সোজা করিতে যে, এক বৎসর লাগিবে, তদ্‌পক্ষে আর সন্দেহ কি? তুমি একবার কলিকাতা আসিলেই এ বিষয়ের সুযুক্তি এবং ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া দিব।" রামচন্দ্র যথানিয়মে কলিকাতা গিয়া শনিবার রাত্রে ঈশ্বরের নিকট অনেক কান্নাকাটি করিলেন, দুঃখ দূরের জন্য অনেক গান গাহিলেন, এবং স্ত্রীর সুমতি হইবার জন্য গুরুমুখ-নিঃসৃত ইংরেজীতে এক বক্তৃতা শুনিলেন। তার পর গভীর নিশীথে, গুরুশিষ্যে নিভৃতে বসিয়া এ বিষয়ে গূঢ় পরামর্শ করিলেন। কিরূপে স্ত্রী-শাসন করিতে হয়, এবং স্ত্রীকে সৎপথে রাখিতে হয়, গুরুদেব তাহার প্রক্রিয়া একটা কাগজে লিখিয়া রামচন্দ্রের হস্তে দিলেন।

প্রাতের গাড়ীতে ডেপুটী-বাবু হুগলী আসিলেন। আহারাদির পর কাছারি যাইবার সময় স্ত্রীকে বলিয়া গেলেন, "তোমার সঙ্গে আজ আমার একটা বিশেষ কথা আছে। কাছারি হইতে যথানিয়মে প্রত্যাগত হইয়া সন্ধ্যার পর স্ত্রীকে বলিলেন—"প্রাণেশ্বরী! তুমি কি আমায় ভালবাস না?"

অন্নপূর্ণা। আজ যে ভারি আদর দেখ্‌চি! এই-ই বুঝি তোমার বিশেষ কথা? ছেলে পিলে এখনও খায় নাই। কি বল্‌তে হয় শিগ্‌গির ব'ল—

রামচন্দ্র। (গম্ভীর ভাবে) তুমি যদি আমায় ভালবাস্‌তে, তা হলে আর রাগ করে এখনি চলে যেতে চাতে না! আমার সে অদৃষ্ট কৈ? (দীর্ঘনিশ্বাস)

অন্নপূর্ণা। (হাসিয়া) আজ যে বড়ই বাড়াবাড়ি দেখ্‌চি। হয়েছে কি?

রামচন্দ্র! না,—আমি কিছু তোমাকে বলতে চাইনা—

অন্নপূর্ণা। রকম্‌ দেখো! বলইনা কি হয়েছে?

রামচন্দ্র এইরূপ কতকটা আসর গরম করিয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন - প্রিয়তমে! তুমি অবশ্যই জান পবিত্র প্রেম ভালবাসাই সংসারের সার বস্তু। কিন্তু তুমি আমার একটা কথাও শোন না কেন? আমি যা চাই, তা আমাকে দাও না কেন? আমি যা ভালবাসি, তা তুমি ঘৃণা কর কেন? আমাকে যদি তুমি ভালবাসিতে তা হলে কি আমার কথা তুমি এরূপ অগ্রাহ্য করিতে পারিতে?

অন্নপূর্ণার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল। সেই সরলা সহধর্ম্মিণী ভালমন্দ কিছুই জানেন না; হঠাৎ তাহার উপর এরূপ বাক্যবাণ নিপতিত হওয়ায় তিনি একেবারে যেন মরমে মরিলেন! বিশেষতঃ, অন্নপূর্ণা বড় সুশীলা ও শান্তস্বভাবা—একটু 'হাবাগোবার' মত। তিনি স্বামীকে যে কি কথা বলিয়া উত্তর দিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না ক্ষণেক উভয়েই নিস্তব্ধ রহিলেন। অবশেষে রামচন্দ্র বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"এই দেখ, সে দিন কলিকাতা হইতে একজন বন্ধু, ভাল পেঁয়াজ এবং কাঁকড়া উপহার পাঠাইয়া দিলেন। তুমি কি না, সেই পেঁয়াজগুলো নিয়ে, টেনে ফেলে দিলে—স্বামীর মনে এত কষ্ট দেওয়া তোমার উচিত হইয়াছিল কি?"

অন্নপূর্ণা। তোমার দুটী পায়ে পড়ি, পেঁয়াজ ঘরে এনো না—ওর গন্ধে নাড়ী উঠে যায়!

রামচন্দ্র! আচ্ছা পাঁটার মাসে ত গন্ধ নাই। তবে মাংস হাঁড়ীতে

রান্ধিতে দাও না কেন? সেদিন একজন মান্যবর বন্ধু স্বয়ং মাংস রাঁধিলেন; তুমি ঘরের থালা পাথর না দিয়ে আমাদিগকে কলাপাতে ভাত খাওয়ালে। তুমি যদি আমাকে ভালবাসিতে, তা হলে কি আর এমন করিতে?

অন্নপূর্ণা একটু অপ্রস্তুত হইলেন। হঠাৎ কোন কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। রামচন্দ্র বলিলেন—"হাঁসের ডিম্‌টায় দোষ কি? সে দিন হাঁসের ডিম ভাতে দিতে বলিলাম; তুমি কিন্তু হুকুম কল্লে, ডিম ভাতে দিলে, হাঁড়ী এবং ভাত উভয়ই নষ্ট হবে; অতএব অন্য একটা পাত্রে ডিম সিদ্ধ করিয়া দাও। শেষে খেতে যেয়ে দেখি, কলাপাতে করিয়া ডিম দেওয়া হইয়াছে। আমাকে এত তুচ্ছ তাচ্ছল্য করা তোমার উচিত হয় কি? আমি যে জিনিষ খাই, তাহা ছুঁইলে যদি তোমার দোষ ঘটে, তাহা হইলে আমাকে ছুঁইলেও তোমাতে দোষ বর্ত্তিতে পারে।"

অন্নপূর্ণা এইবারে বড়ই কাতর হইলেন। দুই চক্ষুর কোন্‌ দিয়া টপ্ টপ বড় বড় ফোটা পড়িতে লাগিল। তিনি যোড়হাতে বলিলেন,— "আমি স্বহস্তে তোমাকে সকল জিনিস রেঁধে দিব, কিছুতেই কষ্টবোধ কর্‌বো না। কিন্তু একটী বিষয়ে তুমি আমাকে ক্ষমা করো আমাকে ওসব কিছু কখন খেতে বলোনা"।

রামচন্দ্র তখন মনে মনে বড় সন্তুষ্ট হইয়া, পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া, অন্নপূর্ণার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,—"মিছামিছি কাঁদ কেন? প্রিয়তমে! চুপ কর, চুপ কর"—

কিন্তু আবার দু দু জল পড়িতে লাগিল। রামচন্দ্র আবার চোখ্ মুছাইয়া দিলেন। অন্নপূর্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"তুমি যাহা খাবে আমি তাহা স্বহস্তে অবশ্যই রাঁধিয়া দিব। তুমি নরকে যাইতে বলিলে, আমি নরকে যাইব—আমার এ সংসারে আর কে আছে? ছেলে দুটী ছোট, তাই ভয় হয়, আমি গেলে, তাদের কষ্ট হবে,—নচেৎ তোমার কোলে মাথা দিয়ে মরার চেয়ে আমার আর সুখ কি?'

রামচন্দ্র মনে মনে বুঝিলেন, গুরুদেবের ঔষধ কতকটা ধরিয়াছে।

প্রকাশ্যে বলিলেন, "স্বামী স্ত্রী একই পদার্থ। কোন ভেদ নাই। প্রেয়সি! তোমার হৃদয় এবং আমার হৃদয় এক। তুমি আর চোখের জল ফেলিও না;—তুমি জান, তোমার ক্রন্দনে আমারও ক্রন্দন।"

স্ত্রী, তখন অঞ্চল দিয়া নিজ মুখচোখ মুছিলেন। স্বামী তখন স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "দেখ প্রিয়তমে! আমরা অন্ধকারে ডুবিয়া আছি। এইবার তুমি আমার কথা ভাল করিয়া বুঝ।"

অন্নপূর্ণা। এ সংসারে তোমা বই আর আমার কে আছে? তোমার কথাই বেদ, তোমার কথাই ব্রহ্ম।

রামচন্দ্র। ভাল করিয়া মন দিয়া শুন। ইংরেজ এদেশে আসা অবধি আমাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুরা বড়ই কুসংস্কারাপন্ন। পাথর কুঁচিকে তারা দেবতা বলিয়া মানে। দেখ, মাংস খাইলে দেহে বল হয়, হিন্দুর সে মাংস খাইতে নিষেধ—আরও দেখ, মুর্গী অতি উপাদেয় জিনিস,—অতীব সসার, সুমিষ্ট, এবং সুগন্ধ্য—কিন্তু হিন্দুরা বলে, সে মুর্গী খাইলে জাতি যায়। কেন বল দেখি, জাত যায়? জাতইবা কি, যাবেইবা কি? আর, এই সব পুষ্টিকর সামগ্রী খাই না বলিয়াইত আমারা এত দুর্ব্বল। নাহিলে কি আজ ইংরেজ আমাদের রাজা হইতে পারিত? হিন্দুদের শাস্ত্র সমস্তই ভুয়াবাজী। আজকালিকার বড় বড় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ইহাই মত।"

অন্নপূর্ণা। শাস্তর মিছে বলো না!

রামচন্দ্র। (হাসিয়া) প্রিয়ে! তুমি যদি শিক্ষিতা হইতে, তাহা হইলে এ কথা কখনই তোমার মুখ দিয়া বাহির হইত না। তোমরা কেবল ভ্রমরূপ অন্ধকারে পড়ে আছ।

অন্নপূর্ণা। সে আবার কি রকম?

রাম। এই বোঝ—লেখা পড়া জানলে, উত্তম জ্ঞান জন্মিলে, সমস্ত ভ্রমই দূর হয়।—মনটা ধপ্‌ধপে পরিষ্কার হয়। এই দেখ, পূর্ব্বেত আমি তোমাদেরই মত অজ্ঞান ছিলাম—পেঁয়াজ, রশুন, পাঁঠার দিক্ দিয়া পথ চলিতাম না; মুর্গী দেখিলে তখন আমার গা শিহরিয়া উঠিত! কিন্তু যেই জ্ঞানটা লাভ হইল, অমনি সব ভ্রম ঘুচিল। প্রেয়সিরে! তুমি যদি একটু

ভলাইয়া বুঝ, তাহাহইলে আজ আমি অনেক কথা বলি। আচ্ছা, আমরা মাছ খাইত। মাছ তুমিও খাও, আমিও খাই, সকলেই খায়। মাছ জলজীব। মাছ-হত্যা, জীবহিংসা। মাছ-ভক্ষণ, জীবদেহ ভক্ষণ। আর, মুর্গীও তাই—স্থলজীব। মুর্গীহত্যা, জীবহিংসা। মুর্গীভক্ষণ জীবদেহ ভক্ষণ। কিন্তু এমনি মজাটা দেখ, শাস্ত্রে মাছ খাইতে বিধি আছে, আর মুর্গীর বেলায় ঘোরতর নিষেধ!—মুর্গী খাইলেই জাত যায়। ছিঃ! এই কি তোমাদের শাস্ত্র! এইরূপেইত স্বর্ণ ভারত শ্মশান হইয়াছে।

অন্নপূর্ণা। একমনে একভাবে নীরব রহিলেন।

রামচন্দ্র, স্ত্রীর হাত ধরিয়া, হো হো হাসিয়া বলিলেন,—"বোধ হয় তোমার হৃদয় আকাশ হইতে কিছু কিছু অজ্ঞান অন্ধকার এইবার দূর হইতেছে। প্রিয়ে! তুমি যেমন বুদ্ধিমতী; তাহার উপর সেইরূপ যদি লেখাপড়া শিখিতে, তাহা হইলে তোমার দ্বারাই মহামঙ্গল উপস্থিত হইত! আমার গুরুদেব, তোমার ন্যায় এইরূপ শিক্ষাবুদ্ধিমতী একটী রমণী সেদিন খুঁজিতে ছিলেন। আহা! তাঁর ন্যায় অমন মহাত্মন্ ব্যক্তি পৃথিবীতে আর নাই। সেই দেবতুল্য পুরুষ কেশবচন্দ্রসেন অতিশিক্ষিত এবং অতিজ্ঞানী বলিয়াই তিনি সর্ব্বস্বত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

অন্নপূর্ণা। তা, আমরা মেয়েমানুষ—এত লেখাপড়া কেমন ক'রে শিখ্‌বো!—আমরা কি আর এত সাত সতের বুঝি!

রামচন্দ্র। হা, হা, হা!—প্রাণরে! তোমার উদরে যে এত জ্ঞান, তা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।

সেই পতিগতপ্রাণা সহধর্ম্মিণী, শিক্ষিত স্বামীর নিকট হইতে প্রত্যহ এইরূপ উন্নতিবিধায়িণী শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণার ক্রমেই মনের আঁধার ঘুচিতে লাগিল। কালোমেঘ, তাঁহার হৃদয়-আকাশ হইতে অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ হইল।

প্রথম মাসে উচ্চশিক্ষার হাতেখড়ি দিয়া অন্নপূর্ণা বুঝিলেন, নবমীতে লাউ খাওয়া নিষেধটা বড়ই কুবিধি। দ্বিতীয় মাসে উচ্চশিক্ষার প্রথমভাগ ধরিয়া বুঝিলেন, পেঁয়াজে গন্ধ ব্যতীত, আর কোন দোষ নাই। গলায় ত্রিকণ্ঠি তুলসীর মালা কেবল অঙ্গভার। অন্নপূর্ণা তৃতীয়

মাসে উচ্চশিক্ষার বোধোদয় আরম্ভ করিলেন। এবার দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। তাঁহার মনে মনে, এইভাব উদয় হইল,—"কেন রমণীকুল চিরদিন পুরুষের পদানত থাকিবে? পিঞ্জরাবদ্ধ শুক পাখীর ন্যায় কেন অন্দরের ভিতর পচিবে?" চতুর্থ মাসে এই ভাব স্পষ্টীকৃত হইল। অন্নপূর্ণা, স্বামীর আদেশক্রমে, আধ-ঘোমটা দিয়া, স্বামীর বন্ধুগণের সাক্ষাতে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে বাহির হইতে লাগিলেন। পঞ্চম মাসে আরও উন্নতি। কেবল একটী ভৃত্যের সাহায্যে, ছেলেপিলে সঙ্গে লইয়া, তিনি কলিকাতা আসিয়া যাদুঘর, পশুবাটিকা, কেল্লা, গড়ের মাঠ, দেখিয়া বেড়াইলেন। ষষ্ঠ মাসে প্রত্যহ বৈকালে স্বামীর সহিত নৌকার ছাদে উঠিয়া, সর্ব্বজনচক্ষুর গোচরীভূত হইয়া, গঙ্গা-নদীর হাওয়া খাইলেন। সপ্তম মাসে তাঁহার মুর্গীতে ঘৃণা রহিল না। অষ্টম মাসে, তাঁহার গৃহে মুষ্টিভিক্ষা বন্দ হইল। নবম মাসে ব্রাহ্মণী-রন্ধনীর বদলে বাবুর্চ্চি পাকশালা অধিকার করিল। দশম মাসে অন্নপূর্ণা সঙ্গীত বিদ্যায় মন দিলেন। একাদশ মাসে একজন মুসলমান ওস্তাদজী আসিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরসঙ্গীতের তান-লয়-মান শিখাইতে লাগিল। দ্বাদশমাসে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে অন্নপূর্ণা বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া ঈশ্বরানুরক্ত ভ্রাতৃগণের সমক্ষে স্বয়ং হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে ঘোর দুর্দ্দিন ঘুচিল। বহুদিনের বদ্ধমূল গাঢ়তর অন্ধকারময় আকাশ নির্ম্মল হইল। সুসভ্যতার শরচ্চন্দ্র হাসিতে লাগিল। কৌমুদীরাশি উছলিয়া পড়িল। পুলকপূর্ণ রামচন্দ্র বলিলেন, "ধন্য গুরুদেবের বীজমন্ত্র! অথবা কর্ত্তা বুঝি স্বয়ং ঈশ্বর।"

'কিন্তু ঐ যে এক আধটু মেঘ এখনও রহিয়াছে! যতই কেন উচ্চশিক্ষা দাও না,—সে মেঘটুক ত আর কিছুতেই কাটিতেছে না সেই সর্ষপ-প্রমাণ কালো মেঘটুকর জন্য রামচন্দ্র বড়ই বিব্রত হইলেন। কিন্তু গুরুদেব তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "ওটুক থাক—চন্দ্রের কলঙ্কই শোভা"

অন্নপূর্ণা স্বামীর শিক্ষাসহবতে, স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য, ক্রমশ সর্ব্বস্বই ছাড়িলেন,—ছাড়িলেন না কেবল—সীঁথার সিন্দুর এবং হাতের 'নোয়া'। উচ্চতম শিক্ষার উন্নতম শাখায় উঠিয়াও অন্নপূর্ণার এ নিদারুণ কুসংস্কার

রহিল,—নির্ম্মল নীলাকাশে এ গুরুপাঢ়তম মেঘবিন্দু রহিল,—ইহাই রাম-চন্দ্রের মর্ম্মযাতনা। শেষ গুরু-উপদেশে মনকে শান্ত করিলেন—

"ফুল্ল কুসুমে কীট, মৃণালে কণ্টক, চন্দ্রে কলঙ্ক থাকাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।"

নবম পরিচ্ছেদ

গোলাপ-ফুলটি কুঁড়ী, কি আধ-ফুটন্ত, অথবা ষোলকলাপূর্ণ—আমি ত কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। আপনারা কেউ যদি পারেন ত দেখুন।

আশ্বিনে, নির্ম্মল, নীল নভোমণ্ডলে নবীন নধর দিবানাথ হাসিতেছেন; নিম্নে নির্ম্মলসলিলা ভাগীরথী জোয়ারে ভাসিয়া, পুলকে স্ফীত হইয়া, কলস্বরে লীলাখেলা করিতেছেন; আর, গঙ্গাপারে, সেই গঙ্গাগর্ভস্থ হর্ম্ম্যের দ্বিতল বারেন্দায়, ফুলরাশি বেষ্টিত হইয়া, ফুলকামিনীবৎ এক ত্রয়োদশবর্ষীয়া "বালিকা" ফুলের মালা গাঁথিতেছেন। ঐ দেখুন, ঐ বুঝুন,—যা করিতে হয়, করুন।

এ কি, —বালিকা, না যুবতী? অথবা বুঝি!

শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন নেল॥
বচনক চাতুরি লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ॥
মুকুর লেই অব করত শিঙ্গার।
সখীরে পুছই কাঁহা অভিসার॥

সেই ক্ষণাঙ্গী "বালিকার" দর্পণে ঘন ঘন মুখদর্শন, সেই সম্মুখস্থিত ফটোগ্রাফচিত্র—সেই কোটীকামবিনিন্দিত মোহনমূর্ত্তি পরমপুরুষ পানে—নবীনার ঘন ঘন কুটিল কটাক্ষ, সেই যুঁই-বেল-গোলাপ-রজনীগন্ধ লইয়া মালা-গাঁথা-ছলে বালিকার সেই ফুল-খেলা, পূর্ণচন্দ্রের ঝলমল হইতে কৌমুদী-রাশি লইয়া রঙ্গভরে সেই লীলাতরঙ্গ,—এই সব দেখিয়া মনে হয়, আমি এই মহাকাব্যময় অনন্ত কাব্যসমুদ্রে কেবল ডুবিয়া থাকি। ইচ্ছা হয়,—সেই মহাকবিতায় কেবল কথা কহিয়া কোকিলকণ্ঠ হই, সেই মহাকবিতার সুধা পান করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হই;—আর, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সদাই আমার রসনা যেন সেই মহাকবিতার গান করে। সাধ হয়, যেন কবিতায় তাঁহাকে ডাকিয়া, বলি,—

ওগো ধনি! প্রাণধন।
শুন মোর নিবেদন,—
সরোবরে স্নান হেতু
যেয়োনা লো যেয়োনা।

যদ্যপি বা যাও ভুলে,
অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে,
কমল কানন পানে,
চেয়োনা লো চেয়োনা।

মরাল মৃণাল লোভে;
ভ্রমর কমল ক্ষোভে,
নিকটে আইলে ভয়,
পেয়োনা লো পেয়োনা।

তোমা বিনা নাহি কেহ,
ঘামে পাছে গলে দেহ,
বায়ে পাছে ভাঙ্গে কটী,
ধেয়োনা লো ধেয়োনা।"

আবার, কখন বা মনে হয়, সংসার উদ্যানের প্রফুল্লিত বকুলতলায় বিরলে বসিয়া বালিকার হাতে ধরিয়া গান গাই :—

আমার নিকটে রবে,
মরম আমারে কবে
এমন শিখাব কথা সুধাবৃষ্টি করিবে।।
আঁচড়িয়া দিব কেশ,
বনাইয়া দিব বেশ;
থাকুক মুনির মন দেবমন ভুলিবে।।
হাবভাব লীলা হেলা,
শিখাইব নানা খেলা,
আসিতে আমার কাছে কাহারে না ডরিবে।

যত দোষ লুকাইব,
যত গুণ প্রকাশিব,
বড় দায়ে ঠেক যদি তুমা হ'তে তরিবে।

এই বালিকাই আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিতা কমলিনী। এখন বালিকাকাল। বাল্যলীলার চরম-খেলা খেলিতেছেন।

কমলিনী, রামচন্দ্রের ঔরসে অন্নপূর্ণার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভূভার হরণের জন্য শক্তিরূপিণী কমলিনী ধরাধামে অবতীর্ণা হন।

অষ্টম বর্ষে কমলিনীর বিবাহ হয়। বৃদ্ধ নরহরি, বহু অনুসন্ধানের পর, সুপাত্র দেখিয়া, পৌত্রীকে যথাবিধি দান করিয়া, গৌরীদানের ফললাভ করেন। পুত্র-রামচন্দ্রে তখন ইংরাজিরস ঈষৎ লব্ধপ্রবিষ্ট হইয়াছে। কন্যার এ বিবাহে তাঁহার সম্পূর্ণ অভিমত বা সহানুভূতি ছিল না। তবে পিতা কর্ত্তা, কৃতিমান্, আর তিনি বিদ্বান্, অকৃতিমান ;— কাজেই রামচন্দ্র, নরহরির কাজে বাধা দিতে সক্ষম হন নাই।

কন্যার বিবাহে অন্নপূর্ণার হর্ষে বিষাদ ঘটিয়াছিল। জামাতা বহুগুণ-বিশিষ্ট হইলেও তিনি দ্বিতীয় পক্ষের বর। মায়ের মনটী কেমন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। তবে বরের গুণাবলীর কথা শুনিয়া, তাঁহার হৃদয় কতকটা শান্তিলাভ করিল।

বরের নাম রাধাশ্যাম রায়। বয়স ত্রিশ বৎসর। বংশ উচ্চ, সম্ভ্রান্ত। বরের বাপ একজন মহাপণ্ডিত বলিয়া দেশবিখ্যাত। তাঁহার ব্যবস্থা, ভাষ,—সর্ব্বমান্য। বহুদূর হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণপত্র আইসে। সেই প্রবীণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আপন টোলে রাধাশ্যামকে নানাশাস্ত্রে শিক্ষা দেন। প্রথম-পত্নী-বিয়োগের পর, পাঁচিশ বৎসর বয়সে, রাধাশ্যাম কাশীধামে দর্শন পড়িতে যান। তথায় দর্শনপাঠের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ যোগ অভ্যাস করেন। তিন বৎসর পরে তিনি গৃহে প্রত্যাগত হন। তার পর দুই বৎসর মধ্যে এই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। রাধাশ্যাম পরম-বৈষ্ণব। তবে সম্প্রদায় বিশেষের মত নাস্তিক-বৈষ্ণব নহেন। কোন কোন বৈষ্ণব এমনও আছেন, যিনি কালীমূর্ত্তি দেখিলে ঘৃণায় নাসিকা বিকৃত করেন।—তারকেশ্বরের চরণামৃতকে কুকুরের প্রস্রাবের সহিত

তুলনা করেন ;—ভগবতীর প্রসাদকে কাকবিষ্ঠা বলেন। এ সব কথা শুনিলেও পাপ আছে। এই মূঢ় বৈষ্ণবদলের সহিত রাধাশ্যামের কোন সংশ্রব ছিল না।

নরহরিও বৈষ্ণব ছিলেন। প্রত্যহ স্নানের পর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের কতকাংশ পাঠ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। কৃষ্ণকথায় তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িত। তিনি রাধাশ্যামের গুণে মোহিত ছিলেন ;— বলিতেন, এমন নাৎজামাই আর পাইব না। নরহরির জীবদ্দশায় রাধাশ্যাম তিনবার শ্বশুর গৃহে আসেন। তখন দাদাশ্বশুরের অন্তরাত্মায়, আনন্দ-লহরী বহিত ; উভয়ে কৃষ্ণকথায় দিন কাটাইতেন। রাধাশ্যামের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা, চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ শুনিয়া বৃদ্ধ নরহরি বড়ই প্রীত হইতেন—যেন ইহকালে স্বর্গ-সুখভোগ করিতেন।

কালক্রমে নরহরির মৃত্যু হইল। ওদিকে রাধাশ্যামের পিতা বহুদিন-ব্যাপী রোগ-শয্যায় শায়িত হইলেন। বৃদ্ধবয়সের রোগ—প্রত্যহ বৈকালে একটু জ্বর হয়, একটু আধটু খুক্ খুক্ কাশেন, আহারে অরুচি! শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। এক মনে এক ধ্যানে, রাধাশ্যাম এ অন্তিম-কালে পিতার সেবা করিতে লাগিলেন। পিতার সংসারে আর কেহই নাই ;—রাধাশ্যামের মা বহুদিন পরলোক গমন করিয়াছেন। পিতা একদিন নিজ জীর্ণ-উত্তপ্তবুকে পুত্রের হাত রাখিয়া বলিলেন, "বাপধন! চলিলাম। দেহের ভোগ এখনও কত দিন আছে বলিতে পারি না। তুমি একাকী; দিনরাত আমার সেবায় তোমার বড় কষ্ট হইতেছে। আমি বলি; ভাল দিন দেখিয়ে, চিঠি লিখে বৌকে আমার ঘরে নিয়ে এস। উভয়ে একত্র আমার সেবা করিবে,—দেখে, আমার বড় আনন্দ হবে।"

পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, পিতার জবানী, রাধাশ্যাম, রামচন্দ্রকে হুগলীতে এক চিঠি লিখিলেন। কিন্তু সে পত্র আজও আসিয়া পৌঁছিল না।

রাত্রি প্রায় আটটা। সেই ফুলবালা কমলিনীর এখনও ফুলখেলা শেষ হইল না। এমন সময় একজন বৃদ্ধা ঝী আসিয়া বলিল—"অ, নাৎনি!— বেশী রাত হয়ে পড়্লো শীগ্‌গির দেনা বাছা, এই বেলা মালা নিয়ে যাই!—

কমলিনী। সন্দেশ থালে সাজান হয়েচেত?

ঝী। সে সব অনেক ক্ষণ ঠিক্ করে রেখেছি!

কমলিনী ঝীকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "তুই আর ১৫ মিনিট পরে এলেই মালা পাবি,—এখন যা।"

ঝী। অগত্যা চলিয়া গেল।

কমলিনী কখন কাঁচি লইয়া, কখন ছুঁচ, আল্পিন লইয়া, কখন বা ছুরি কাঁচি লইয়া, মোহন মালা গাঁথিতে লাগিলেন।—

ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়া রে।
বনমালি মেঘমালি কালিয়া রে॥

মোহন মালার ছাঁদে,
রতিকাম পড়ে ফাঁদে,
বিরহ অনল দেই জ্বালিয়া রে।

যখন যে দিকে চায়,
ফুল বরষিয়া যায়,
মোহ করে প্রেম-মধু ঢালিয়া রে॥

নাসা তিল ফুল পরে,
অঙ্গুলী চম্পক ধরে,
নয়নকমল কামে টালিয়া রে।

দশন কুন্দের দাপে,
অধর বান্ধুলী চাপে,
ভারত মাজল ভাল জালিয়া রে॥

ক্রমে একগাছি, দুগাছি করিতে করিতে চারিগাছি মালা গাঁথা হইল। কমলিনী যে মালাটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিলেন, সেইটী ঝীয়ের থালে সাজাইয়া দিলেন। মালার গায়ে টীকিট-আঁটা। তাহাতে অতিক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা আছে,—

চিকন গাঁথনে বাড়িল বেলা।
তোমার কাজে কি আমার হেলা॥

না জানিয়া কষ্ট দিয়াছি মরি।
ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি॥

কমলিনী তখন অপর তিনগাছি মালা বাক্সের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

এখন বঙ্গসাহিত্যবিদ্ সুধী-সমাজে কথা উঠিতে পারে, তের বছরের বালিকা, কবিতা লেখে কেমন করিয়া? কেমন করিয়া যে লেখে, তা ভগবানই বলিতে পারেন। কমলিনী স্বহস্তে কবিতা লিখিলেন, পাঠাইলেন,—আর আমি সে কথা বলিতে পারিব না? কিন্তু খবরের কাগজে, সাময়িক পত্রে, মাঝে মাঝে দেখিতে পাই—সম্পাদক নোট করিতেছেন, অমুক কবিতাটী কোন চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালকের লেখা—অমুক গীতিটী কোন বোধোদয়-পাঠিকার লেখা।

সে যাহোক, ঝী'ত মালা লইয়া ভেট দিতে গেল।

আহারের সময় হইলে ডেপুটী-বাড়ী ঘণ্টা বাজিত। ঠিক সাড়ে আটার সময়, আহারীয় ঘণ্টা-ধ্বনি হইল। কমলিনী ত্বরাত্বরি ভোজনগৃহে গিয়া আহারাদি করিয়া আসিলেন। প্রথমত নিজ কক্ষে গিয়া, তিনি খাটের উপরই দুগ্ধফেননিভশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। রাত্রি দশটার মধ্যে নিদ্রাদেবীর কোমল কোলে সকলে ঘুমাইল। ডেপুটী বাবুর গৃহ নীরব—নিস্তব্ধ। অবনী স্থির গম্ভীর। লোক-কোলাহল ফুরাইল। কেবল সেই চাঁদটার বিরাম নাই—সেই ঝক্‌ঝকে ঝলমলে আলোর, সমস্ত রাত্রির জন্ত, সে যেন সদাব্রত খুলিয়াছে; আর বিরাম নাই—গঙ্গাটার; কল্‌কল্‌কলকণ্ঠের একটানাসুর সমভাবেই চলিয়াছে। কাব্যপ্রিয়া কমলিনী এ কবিতাময় কালে ঘুমাইলেন, কি জাগিয়া রহিলেন,—তাহা কে বলিতে পারে?

দশম পরিচ্ছেদ।

এমামবাড়ীর ঘড়ীতে "ঢঙ্ ঢঙ" করিয়া মহা শব্দে রাত্রি একটা বাজিল। সেই এক ঘায়ে সহর পূর্ণ হইল! যেন হিমালয় শিখর হইতে শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইলেন। তবে রাত্রিকাল, হুগলীবাসী নিদ্রিত; কাজেই সে শব্দের গুরুত্ব বড় কেহ অনুভব করিলেন না।

জ্যোৎস্না আলোকে দেখা গেল, ডেপুটী বাবুর অট্টালিকার বারেন্দার ঠিক নীচে, 'গঙ্গাগর্ভে' একখানি পান্সী বাঁধা রহিয়াছে। "মালিনী-মাসী-গোছ" একটা ঝী শুভ্র-বসনে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ির দ্বারে, স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। দোয়ার খোলা।

ডেপুটী বাবুর বাড়ীর পার্শ্বেই বাগান। বাগানটী খুব বড়ও নয়, খুব ছোটও নয়। বাগানটী আমবাগানও নয়, লিচু বাগানও নয়, সখের ফুলবাগানও নহে। অথচ সবই আছে। উদ্যান-অধিকারি বড় হিসাবী লোক। বাগানের প্রথম ভাগটা, দেশী বিলাতী বিবিধ ফুলগাছে বিভূষিত। দ্বিতীয় থাকে দুই সার কলমের আমগাছ। তার পর, কয়েকটী বড় বড় আঁটীর আমগাছ। আমের পরই কাঁঠাল গাছ। কাঁঠাল ফুরাইলে, লিচু গাছ আরম্ভ। তার পর, যাম, বাতাপি লেবু, কমলা লেবু; পাতি লেবু, দাড়িম, পেয়ারা, আতা, কুল (ত্রিবিধ), খেজুর, তাল, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষনিচয় যথানিয়মে সন্নিবেশিত। অবশেষে দুঝাড় বাঁশ, বাব্লাগাছ, এবং অন্তিমে গঙ্গার ধারে খানিক সরবনও আছে। এ ছাড়া, বাগানের মাঝে মাঝে, উপযুক্ত স্থানে, সুবিধামত পুঁই-মাচা, লাউ-মাচা আছে; পুনুকে শাক, পালঙ্ শাক, এবং নটে শাকের ক্ষেত আছে;—অধিক কি, পানের বোরজও একটী আছে।

এ উদ্যানটীর সঙ্গে ডেপুটী বাবুর কোন সম্পর্ক নাই। কেবল ফুলের সুগন্ধ উপভোগ করিবার তাঁহার অধিকার আছে। যিনি ডেপুটীর বাসার মালিক, তিনি বাগানেরও মালিক। সেই জ্যোৎস্নামাখা, শারদীয় গভীর নিশীথে, সেই উদ্যানমধ্যস্থ অট্টালিকা নীরব, উদ্যান নীরব, সেই শুভ্র-বসনা, শুভদর্শনা ঝী নীরব, পানসীর দাঁড়ী মাঝী নীরব।

ও—কি—ও!!! দুইটী লোক—মালকোঁচা-মারা, হাতে এক এক গাছি মোটা ছোট লাঠি—বাঁশতলা থেকে দ্রুতপদে আসিতেছে নয়? দেখিতে দেখিতে আরও দুটী লোক, বড় আমগাছটা হইতে ধীরে ধীরে নামিল। ইহাদের মধ্যে একজনের হাতে হাতীর দাঁতের বাঁধান মোটা বেতের ছড়ি,—অপরের হাতে একটা পিস্তল। ঐ যে লিচুতলা থেকে আরও একজন লম্বা লাঠি ঘাড়ে করিয়া হন্ হন্ আসিতেছে। এমন সময়—ইহারা কে গো? ডাকাত নাকি? ডাকাত'ত চেরা সিঁথি কেন? কাহারও হস্তাঙ্গুলীতে হীরকাঙ্গুরীয় চন্দ্রালোকে ঝক্ঝক্ করিতেছে! কাহারও অঙ্গে টাট্‌কা ইস্তিরি-করা ডবলব্রেষ্ট কামিজ,—তাহার উপর বেল ফুলের মালা দোদুল্যমান। তৎকালে কেহবা অমনি পকেট হইতে শিশি বাহির করিয়া লাবেণ্ডার জল একটু মাথায় দিল।

সেই ঝী, গঙ্গাভিমুখ গৃহদ্বার খুলিয়া, যাঁহার প্রতীক্ষায় নীচে দাঁড়াইয়াছিল, নিঃশব্দপদসঞ্চারে সেই পুরুষ দ্বিতল হইতে সিঁড়ি দিয়া নিম্নে অবতরণ করিলেন। তাঁহার বাম হস্তে একটী গোলাপ ফুল, দক্ষিণ হস্তে একগাছি মিহি-ছড়ি। সেই পুরুষ যেমন ভূতলে পদার্পণ করিলেন, অমনি চেরা সিঁথি-কাটা পাঁচ জন ডাকাত, বাগান হইতে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া নিমেষ মধ্যে, তাঁহার উপর পড়িল। যেন ক্ষুধিত ব্যাঘ্রনিচয়, মেষশাবকের উপর পতিত হইল। পুরুষ ভীত, কম্পিত কলেবর,—ভীতিব্যঞ্জক ভাঙ্গাভাঙ্গা স্বরে বলিলেন,—"তোমরা কি চাও, তোমরা কি চাও!" ঝী চেঁচাইয়া উঠিল,—"ওগো, বাবাগো, ডাকাতে আমাকে কেটে ফেল্লে গো!—" ডাকাতদল কোন কথা না কহিয়া, প্রথমে সেই বাবুর হাতে এক মিঠে-কড়া-লাঠি বসাইয়া দিল। তাঁহার হাত হইতে সেই গোলাপ ফুলটী এবং সরু ছড়িটী ভূতলে পড়িয়া, গেল। অমনি সকলে মিলিয়া তাঁহার উপর কেহ কীল, কেহ লাথি, কেহ ঠোণা, কেহ জুতা বর্ষণ করিতে লাগিল। "রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া বাবু ভূতলে পড়িয়া গেলেন। নাক দিয়া তাঁহার হু হু শব্দে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। এই কার্য্য বোধ হয় অর্দ্ধ মিনিটের মধ্যে সম্পাদিত হইল।

ঝীয়ের চীৎকার, পান্সীর মাঝীদের চীৎকার, এবং বাবুর চীৎকার—এই তিন চীৎকার একত্র হইয়া এক মহা কোলাহল উত্থিত হইল। ডাকাত,

ডাকাৎ, ডাকাৎ রবে ভাগীরথী প্রতিধ্বনিত হইল। মাঝারা ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, নৌকাতেই বসিয়াই রহিল। ঝীটা খুব পাকা—সে কেবল বলিতে লাগিল, "ওগো বড় কর্ত্তা, তুমি একবার নিচে নেমে এসো,—আমাদিগের ডাকাতে কেটে ফেল্লে।"

এইরূপ হাঁকাহাঁকিতে প্রতিবেশিমণ্ডলী, কনেষ্টবল, ডেপুটী বাবু এবং তাঁহার ভৃত্যগণ—সকলেরই ঘুম দূর হইল। পাড়ার কয়েক জন লোক বাগানের দূরস্থ ফটকের গোড়ায় আসিয়া হো হো করিতে লাগিল। দুইটা কনেষ্টবল সেই ফটকে ধাক্কা দিয়া কেবল বলিতে লাগিল, "জল্‌দি দরোয়াজা খোল্ দেও!"—কিন্তু সে কথা শুনেই বা কে? আর ফটক খোলেই বা কে? ওদিকে স্বয়ং ডেপুটী বাবু, দুইজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে ত্রিতলের ছাদে উঠিয়া বন্দুকে গুলি পূরিয়া, বাগানের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি এখনি গুলি করিয়া সকলের প্রাণবধ করিব। বল, কে আমার বাড়ী ডাকাতির চেষ্টা করতেছ? যার এত সাহস, সে আমার সম্মুখে এখনি আসুক! এই গুলি করিলাম,—করিলাম—করিলাম!;--কিন্তু কৈ ডাকাত? কৈ ডাকাত?—" বস্তুত, আর কাহাকেও তখন সেখানে দেখা গেল না! ডাকাতদল যে কোথায় হঠাৎ কোন্ দিক দিয়া পলাইল, তাহার কেহই ঠিক করিতে পারিল না। নিম্নে আর কেহই নাই, কেবল সেই ঝী, এবং সেই আঘাতপ্রাপ্ত, ভূপতিত মূর্চ্ছিত বাবু। ঝী তখন ডেপুটি বাবুকে ছাদের উপর দেখিয়া, একটু সাহস পাইয়া হাঁকাহাঁকি করিয়া বলিল, "ও, কর্ত্তাবাবু, একবার নেবে আসুন—দেখুন্-সে, ঘনেশ্যাম বাবুকে ডাকাতরা খুন করে গেছে।

ডেপুটী বাবু। (উচ্চরবে) অ্যাঁ, ডাকাতরা কি পালিয়ে গেছে?—কোন্ দিকে গেল, তুই বল্‌তে পারিস্!" ডেপুটী বাবুর একজন অনুচর ভৃত্য বলিল, "ডাকাত কি আর এখানে থাকে, যে আপনার বন্দুক! ঐ বন্দুক দেখেই তাহারা পালিয়েছে—"

ডেপুটী বাবু তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া, ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে নীচে নামিলেন। বাগানের ফটক খোলা হইলে, বিস্তর লোক একত্র হইল। কনেষ্টেবল, ইনস্পেক্টর, শেষে পুলিস-সাহেব আসিল। পাড়ার সকলে

বলাবলি করিল, "কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! ডেপুটী বাবুর বাড়ী ডাকাতি! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা?"

সেই ভূপতিত মূর্চ্ছিত বাবুটীর নাম নবঘনশ্যাম নন্দী। মুখে জল দিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া তোলা হইল। তিনি অচিরে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। দেখা গেল, প্রহার সাংঘাতিক নহে। কেবল নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে। কতকটা ভয়ে কম্পিত হইয়া তিনি মূর্চ্ছা যান। ডান হাতের গাঁট তাঁহার বিষম ফুলিয়াছে—এবং তাহাই বড় কণ্ কণ্ করিতেছে! চোখে, মুখে, নাকে, কপালে ঠাণ্ডাজল দেওয়াতে, এবং অনবরত পাখার বাতাস করাতে, তিনি অনেকটা সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ হইলেন।

ওদিকে, উদ্যানে ডাকাত এখনও লুকাইয়া আছে কি না—তাহারই অনুসন্ধান চলিল। বাঁশবন, সরবন, কলাবন—সমস্ত বন খোঁজা হইল। কেহ বা পুলিস সাহেবের হুকুমে বড় বড় আমগাছে উঠিয়া দেখিতে লাগিল,—গাছের মগ্‌ডালে ডাকাত বসিয়া আছে কি না! কেহ বা পেয়ারা গাছ নাড়া দিতে লাগিল;—ডাকাত থাকে ত ঝরিয়া পড়িবে! কেহ খেজুর গাছে ঢিল মারিতে লাগিল। এত অনুসন্ধানেও ডাকাত মিলিল না। পুলিস সাহেব ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া অনুচরগণের প্রতি বলিলেন, "তোমরা বড়ই অকর্ম্মণ্য!—এই বাগানের মধ্যে তোমরা কি ডাকাতির কোন চিহ্নও পাইলে না?" তখন আবার মসাল জ্বালিয়া লণ্ঠন লইয়া, চিহ্ন-অনুসন্ধান হইতে লাগিল! বাঁশবনের কাছে একজন কনষ্টেবল একটা রুমাল কুড়াইয়া পাইল। আনন্দকোলাহলে, সকলে সেই রুমাল আনিয়া পুলিসসাহেবকে দিল।

অতি ধীর, গম্ভীরভাবে, অথচ হর্ষোৎফুল্ললোচনে স্বয়ং পুলিস-সাহেব সেই রুমাল পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ডেপুটীবাবু, পুলিস-সাহেবের বামপার্শ্বে গিয়া বসিলেন। ইনস্পেক্টর বাঙ্গালী। তিনি ইষৎ দূরে দাঁড়াইয়া, সাহেবের উপদেশমত রুমালের বর্ণন লিখিতে লাগিলেন। সে লেখার মর্ম্মানুবাদ এইরূপ,—

(১) রুমাল রেশ্‌মী। দেখিতে হইবে, কোথাকার রেশম? কোন্ হাটে, বাজারে বা দোকানে কাহা কর্ত্তৃক, কোন্ তারিখে, কাহাকে বিক্রীত

হইয়াছিল? যে ব্যক্তি রেশম খরিদ করে, সে কোন্ জাতি? ঘর কোথা? তার রুমাল বয়নের কারখানা আছে কি না?

(২) রুমালবিক্রেতা কে? কবে কোন্ তারিখ কাহাকে সে বিক্রয় করে? মূল্য কত?

(৩) রুমাল ধোপাবাড়ী গিয়াছিল। ধোপার চিহ্ন। সে কোথাকার ধোপা? কোন্ জাতি? বয়স কত? কাহার কাহার নিকট হইতে সে কাপড় কাচিতে লয়? কত দিন সে এ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে?

(৪) রুমালের চার কোনে চারিটী ফুল আছে। ফুলের আকৃতি *। কোন্ কোন্ শিল্পী এদেশে এরূপ ফুল তৈয়ারি করে?

(৫) রুমালের চারিধারে বড় বড় বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা আছে— 'মনে রেখো ভুল না" কোন্ কোন্ শিল্পী ইহার কারিকর?

(৬) রুমালের এক কোণে বাঁধা একখানি বাঙ্গালা হাতের-লেখা-কাগজ পাওয়া গেল। তাহাতে দুইটী কবিতা লেখা আছে। একটী কবিতা কালো কালীতে, অপরটী রাঙ্গা কালীতে লেখা।

(ক) কালো কালীর কবিতা;—

বঁধু! কি আর বলিব আমি!
মরণ জীবনে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হয়ো তুমি॥ ১॥

তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, এক মন হৈয়া,
নিশ্চয় হৈলাম দাসী॥ ২॥

ভাবিয়া ছিলাম, এ তিন ভুবনে,
আর মোর কেবা আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই,
দাঁড়াব কাহার কাছে॥ ৩॥

একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে,
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু,
ও দুটী কমল পায়॥ ৪॥

না ঠেলহ ছলে, অবলা আখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥ ৫॥

(খ) রাঙ্গা কালীর কবিতা ;—
রাই! তুমি সে আমার গতি!
তোমার কারণে, রসতত্ব লাগি,
গোকুলে আমার স্থিতি॥ ১॥

নিশি দিশি সদা, বসি আলাপনে,
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে, তোমার কারণে,
বসে থাকি তার তীরে॥ ২॥

তোমার রূপের, মাধুরি দেখিতে;
কদম্ব তলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরি, চারি দিক হেরি,
যেমন চাতক পাখী॥

তব রূপ গুণ, মধুর মাধুরী,
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান,
তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥

(৭) এই কবিতা দুইটী কাহার হাতের লেখা দেখিতে হইবে। এবং ইহার অর্থ কি, উদ্দেশ্য কি, বুঝিতে হইবে। যদি সহজে কাহার হাতের

লেখা ঠিক করা না যায়, তবে এই কবিতা দুইটী লিথোগ্রাফ করিয়া ছাপাইয়া থানায় থানায় পাঠাইতে হইবে।

রুমালের বর্ণন লিপিবদ্ধ হইলে, পুলিসসাহেব, নবঘনশ্যামের এজেহার গ্রহণে উদ্যোগী হইলেন। ঘনশ্যাম বলিলেন, "অদ্য আমি বিকলাঙ্গ, অসুস্থ, এবং অপ্রকৃতিস্থ; সব কথা গুছাইয়া এখন বলিতে পারিব না।" পুলিসসাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি অল্প স্বল্প যা পারেন, তাই আজ বলুন। কারণ অদ্য রাত্রি হইতেই আমি অনুসন্ধান আরম্ভ করিব। আমার প্রিয়বন্ধু রামচন্দ্র বাবুর বাড়ী ডাকাতি হইয়াছে, আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না।" ডেপুটী রামচন্দ্র বাবু বলিলেন, "ঘনশ্যাম বাবু আমার বিশেষ বন্ধু এবং সাধু-চরিত্র।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর ঘনশ্যাম বাবুর সংক্ষিপ্ত এজেহার গৃহীত হইল;—

"আমার নাম শ্রীনবঘনশ্যাম নন্দী। জাতি কায়স্থ। বয়স ২৪ বৎসর। নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত——গ্রামে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিধারী। আমি ওকালতী পরীক্ষা দিব। কলিকাতায় পড়ি। আমি জমীদার।

"আমি শিরঃপীড়া রোগগ্রস্ত। ডাক্তারের পরামর্শে হুগলিতে আমি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আজ তিন মাস আসিয়াছি। আমার বাসা বাবু-গঞ্জে। রাত্রে, চন্দ্রালোকে, গঙ্গার বায়ুসেবন, আমার চিকিৎসকের ব্যবস্থা। আমি প্রত্যহ এইরূপ ভাবে চিকিৎসিত হই। ইহা ব্যতীত দিবসে অন্যান্য ঔষধও সেবন করি।

"অদ্য আমি বায়ু-সেবন করিয়া বাঁশবেড়ে হইতে ফিরিতেছি। পথে অসহনীয় প্রস্রাবপীড়া হইল। মাঝীদিগকে বলিলাম, ডেপুটী বাবুর বাটীর সম্মুখে নৌকা থামাও। আমি ধীরে ধীরে তীরে উঠিয়া আসিতেছি; দেখিলাম, একদল ডাকাত লাঠি সড়কি, বন্দুক, ছোরা লইয়া ডেপুটীবাবুর বাটী আক্রমণার্থ বেগে ধাবিত হইতেছে। আমি "কেও, কেও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। কার্য্যে বাধা পাইয়া, তাহারা অগ্রে আমাকেই আক্রমণ করিল। তারপর মহাগোলযোগে সকলে জাগিয়া উঠিল। বেগতিক দেখিয়া ডাকাতরা পলাইল।

ডাকাতদের চেহারা [কৃষ্ণবর্ণ। ঝাঁকড়া চুল! মুখে কালীচুণ-মাখা তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় চিনিতে পারি।

আমাকে মারিয়া ফেলা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাহারা গৃহ-প্রবেশের চেষ্টায় ছিল; আমি তাহাদের কার্য্যে বাধা দেওয়ায়, আমাকে প্রহার আরম্ভ করে।”

ঘনশ্যাম বাবুর এজেহার লইয়া পুলিস-সাহেব মন্তব্য লিখিলেন “কালো চেহারা ঝাঁকড়া চুল, এবং মুখে-কালীচুণ-মাখা লোকের অদ্য হইতে বিশেষ-অনুসন্ধান করা আবশ্যক।”

তারপর ঝীয়ের এজেহার লওয়া আবশ্যক হইল। কিন্তু ঝী তখন পলাইয়া গৃহিণী অন্নপূর্ণার আশ্রয় লইয়াছে। ঝীটা বলিতেছে, “মা তোমরা আমাকে কেটে ফেলো, তাতে আমি রাজী আছি; কিন্তু আমি মেয়েমানুষ;—সাহেবের সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা ব’লতে পারবো না।”

অন্নপূর্ণা। আচ্ছা, তুই এখন থাম্। আমি তাঁকে ডেকে আগে জিজ্ঞাসা করি—তারপর, তোর যাতে ভাল হয়, তা করবো।

ঝী। (কাঁদ কাঁদ সুরে) আমরা গরীব দুঃখীর মেয়ে, গতর খাটিয়ে খেতে এসেছি! আমি কোন দোষের দুষী নই। তা, আমি লাজ শরমের মাথা খেয়ে, সাহেবের কাছে কেমন ক’রে দাঁড়াবো গো! আমার পোড়া অদেষ্টে কি শেষে এই ছিলো?

ঝীয়ের নাকে কাঁদার নিবৃত্তি নাই। সে একটানা সুর বুঝি অনন্ত-কালেও থামিবে না। বুঝি সে সুরের তাল নাই, ফাঁক নাই, সোমের ঘরও নাই! বুঝি সে অনন্ত একটানায় কখন জোয়ার ভাটা নাই!

গৃহিণীর আদেশক্রমে কর্ত্তা অন্দরে আসিলেন। অন্নপূর্ণা রামচন্দ্রকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। ডেপুটী বাবু উত্তর দিলেন; তার আর ভাবনা কি? আমি সাহেবকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিতেছি।

এই বলিয়া, রামচন্দ্র বহির্বাটীতে আসিয়া সাহেবকে বলিলেন, “আমার ঝীটী অতি লজ্জাশীলা; সে, আপনার সাক্ষাতে বাহির হইতে সঙ্কুচিত হয়। যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে, তবে তাহার এজেহার আমি লিখিয়া লইয়া প্রাতে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।”

পুলিস-সাহেব। ইহাতে আমার কিছুই আপত্তি হইতে পারে না। আপনি তাহাই করিবেন।

পুলিস-সাহেব এইরূপ ডাকাতির তদারকের প্রথমপর্ব্ব শেষ করিয়া, রাত্রি প্রায় ৪ টার সময়, সদলে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। উদ্যানে প্রায় সহস্রাধিক লোক একত্র হইয়াছিল ঘনশ্যাম বাবু খুন হন নাই, এবং ডেপুটী বাবুর লোহার সিন্দুক ভগ্ন হয় নাই,—দেখিয়া, তাহারা দুঃখিতান্তকরণে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল। এ গোলমালে বোধ হয় সহরের পনের আনা লোক জাগ্রত হইয়াছিল। জাগেন নাই, কেবল সেই ডেপুটীকন্যা শ্রীশ্রীমতী কমলিনী। সকলে চলিয়া গেলে, কমলিনীর গৃহের দ্বার ঠেলিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "মা, কমল, ওমা কমল— উঠ মা—"

কমলিনী আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া, খিল খুলিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি হয়েছে মা, কেন মা আমাকে উঠাচ্ছ?"

অন্নপূর্ণা। মা, ঘরে আজ ডাকাত পড়েছিলো—তা ভাগ্যে—

কমলিনী। বলো কি মা? বলো কি মা?—আমি কি তার কিছুই জানিতে পারিলাম না?—

অন্নপূর্ণা। তুমি মা. সমস্ত দিন পড়াশুনা কর—পরিশ্রম হয়, তাই খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলে—

কমলিনী "ডাকাত কি মা!" "ডাকাত কি মা!!"—"ডাকাত! ডাকাত!!"—বলিতে বলিতে ভয়ে ঠাই ঠাই কাঁপিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। অন্নপূর্ণা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

নগরে আজ মহা কোলাহল। ঘরে ঘরে লোক ডাকাতির গল্প করিতেছে। কেহ বলিতেছে, পুলিস-সাহেবের বুকে ছোরা মেরে ডাকাতরা পালিয়েছে। কেহ আস্ফালন করিতেছে, "ডাকাতদের এক এক গাছ লাঠি ঠিক্ ১৮ হাত লম্বা। সে লাঠির কাছে এগোয় কে?" কোন নবীনা ভাবিনী, ঘনশ্যামের উদ্দেশে দুঃখ করিতেছেন; "আহা! পরের ছেলে হাওয়া খেতে এসেছিলো,—ডাকাতরা তাকে কি না আধ-খুন ক'রে ফেলে গেল গা!" একজন প্রবীণা বলিলেন, "আহা! রাত্রে ডাকাতে ডেপুটী বাবুর সর্ব্বস্বটী লুটে নিয়ে গেছে—নেয়ে প'রবার কাপড়টী নাই। পেতে শোবার মাদুরি খানি নাই। ভিজিয়ে খাবার একটী বাটী পর্য্যন্ত নাই। কি দুঃখ গা! ভগবানের এতই কষ্ট কি দিতে হয়?"

অন্যদিকে কেবল হাসি, আর কৌতুক। একজন প্রতিবেশী ভট্টাচার্য্য তালে তালে, হাততালি দিতে দিতে, গাহিতে লাগিলেন;—

প্রভাত হইল বিভাবরী,
বিদ্যারে কহিল সহচরী,
সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা
সখী তোলে ধরাধরি করি॥

সেই সুরে সুর দিয়া অন্যজন গাহিলেন,—

লুকায়ে প্রণয় কৈনু,
কুল কলঙ্কিণী হৈনু,
আকুল পরাণ মোর অকূল পাথারে।
সুজন নাগর পেয়ে
আগু পাছু নাহি চেয়ে
আপনি করিনু প্রীতি কি দূষিব তারে॥
লোকে হৈল জানাজানি,
আদালতে কাণাকাণি,
আপনা বেচিয়া এত কে সহিতে পারে

যায় যা'ক জাতি কুল,
কে চাহে তাহার মূল,
ভারতে সে ধন্য শ্যাম ভাল বাসে যারে॥

তৃতীয় ব্যক্তি গাহিল,—

চলহে ডাকাত ধরি গিয়া!
রমণীমণ্ডল ফাঁদ দিয়া।
তেয়াগিয়া ভয় লাজ,
সকলে করহ সাজ,
সে বড় লম্পট কপটিয়া।

জানে নানা মত খেলা,
দিবস রেতের বেলা,
চুরী করে বাঁশী বাজাইয়া॥

সে বটে বসন-চোরা,
তাহাকে ধরিয়া মোরা,
পীতধড়া লইব কাড়িয়া।

সদা ফিরে বাঁকা হয়ে,
আজি সোজা করি লয়ে,
ভারত রহিবে পহরিয়া॥

ঠাকুরবাড়ীতে, অতিথিশালায়, আদালতগৃহে, কালেজে, স্কুলে—হাটে মাঠে, গৃহে, গোঠে—সর্ব্বত্রই ঐ ডাকাতির কথা। কেহ বীররস, কেহ আদিরস, কেহ বা রৌদ্ররসে ডাকাতির রূপগুণরস বর্ণন করিতেছে। ডাকাতিটাকে কেহ বলিতেছেন, মহাকাব্য; কেহ খণ্ডকাব্য; কেহ বা গীতিকাব্য বলিতেছেন। এমনও লোক আছেন, যিনি বলিতেছেন, যে, ইহা কেবল রামায়ণ-মহাভারতের একত্র সমাবেশ! অথবা কবিরঞ্জন-ভারতচন্দ্রের শুভ সম্মিলন! কিম্বা যেন কালিদাস-সেক্ষপীয়রের প্রেম-আলিঙ্গন! ফল কথা কোন রকম বর্ণনাতেই কেহই তৃপ্তি লাভ করিতে

পারিতেছেন না। শেষে একজন রসিক পুরুষ বলিয়া ফেলিলেন, এটা ——ভগবদ্গীতা। দেখা গেল, যেন ইহাতে অনেকের মন কতকটা আশ্বস্ত হইল।

এই ডাকাতি ব্যাপারে হুগলী-ব্রাঞ্চস্কুলে, আজ মহাকুরুক্ষেত্র-কাণ্ড। তখন শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর দাস ব্রাঞ্চস্কুলের হেড্মাষ্টার বা অধিপতি ছিলেন। বীরেশ্বর বাবুর প্রচণ্ড প্রবল প্রতাপ। তাঁহার দন্তে, বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়। দীর্ঘাকার, হৃষ্টপুষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ,—তাঁহার সে বিভীষণ মূর্ত্তির পানে চায় কে? তাঁহার এক একটা হুঙ্কারে, দুদশটা বালক মূর্চ্ছা যাইত। পদভরে মেদিনী কাঁপাইয়া, তিনি কোন ক্লাস দিয়া চলিয়া গেলে, বালকগণ অমনি অবনত বদনে, ভয়ে চক্ষুদ্বয় মুদিয়া ফেলিত।

বালক-শাসনের তাঁহার নানারূপ প্রহরণ ছিল। প্রথম, দন্তকিটিমিটি এবং তীব্র চাহনি। দ্বিতীয় গভীর চীৎকার এবং ঠেলিয়া দেওয়া—"যাঃ ক্লাসে যেয়ে স্থির হয়ে বোস্‌গে"। তৃতীয়, কাণমলা, চড়, চাপড়, ঘুষা, কীল, চুল ধরে টান্া। চতুর্থ, চাবুক। পঞ্চম, হাতা।

হাতাটা কি রকম অস্ত্র, কেহ বুঝিলেন কি? বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, এবং বীরেশ্বর বাবুর হাতা—বোধ হয় একই জিনিস। হাতা ধাতব নহে, দারুনির্ম্মিত। স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা ইহার শিল্পী কি না, তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত নহি। ইহার নির্ম্মাণকৌশল বড়ই বিচিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। দৃশ্যতঃ ঠিক সাধারণ লোহ-হাতার ন্যায় বলিয়াই উহার নাম হাতা হইয়াছে। সুগোল, সুলম্বা, বার্ণিস্‌-করা, ফুলকাটা, প্রায় দেড় হাত পরিমিত সেই তাহার বাঁট। বাঁটের অগ্রভাগ, এবং শেষভাগ হাতীর দাঁতে বাঁধান। বাঁট শেষ হইলে, প্রফুল্ল আম্রবৎ চক্রাকার, মেহগ্‌নী কাঠের এক চক্রদণ্ড। সেই চক্রদণ্ডে ঝাজরীর ন্যায় প্রায় শতাধিক ছিদ্র। সেই হাতা-হস্তে, বীরেশ্বর বাবুর বিরাট মূর্ত্তি দর্শন করিলে মনে হইত, দণ্ডধারী যম ইহার কাছে কোথায় লাগে?

হাতা ব্রহ্মাস্ত্র, বৎসরের মধ্যে কদাচিৎ কখন, কালেভদ্রে প্রয়োগ করিতে হয়। গুরুতর অপরাধে; গুরুতর দণ্ড। যে বালকের রোগ, এ দণ্ডেও না দূর হয়, সে স্কুল, হইতে দূরীভূত হয়।

হাতার প্রয়োগ—অঙ্গের কোন অংশে?—কর-কমলে। হাতার দিন, একঘণ্টা পূর্ব্বে স্কুলের ছুটী। সমুদায় বালক, এবং শিক্ষকগণ যথানিয়মে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, ব্রাঞ্চস্কুলের সেই সুবৃহৎ হলে দাঁড়াইয়া, বসিয়া, হাতার প্রক্রিয়া নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন।

বেলা প্রায় ৩ টা। বালকগণ আজ আমোদ করিয়া বলিতেছে, "অরে, আজ হাতা হবে রে!" শিক্ষকগণ, এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ছুটী হইবে বলিয়া, শীঘ্র শীঘ্র পাঠ শেষ করিতেছেন। দ্বারবান ফটক খুলিয়া দিবে বলিয়া, ফটকের নিকট দণ্ডায়মান। মাগীটা জলের ঘরে চাবী দিবার যোগাড়ে আছে। আর, দপ্তরী-সাহেব টুপিটী ঝাড়িয়া, পুনরায় মাথায় দিবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময় তিনটা বাজিল। বীরেশ্বর বাবু ঘণ্টা ধ্বনি করিতে লাগিলেন। আরতির ঘণ্টার ন্যায়, তাঁহার নিকট একটা ঘণ্টা থাকিত। স্কুল বসিবার এবং ছুটী হইবার কালে সেই ঘণ্টা তিনি স্বয়ং স্বহস্তে টুং-টুং-টুং রবে প্রায় পাঁচ মিনিট কাল বাজাইতেন। দেখিতে দেখিতে প্রায় পাঁচশত বালক, নয়জন শিক্ষক এবং দুই জন পণ্ডিত, সেই হলে একত্র হইলেন।

বিরাট দরবার। বেত্রহস্তে বীরেশ্বর বাবু, বজ্রহস্ত দেবরাজের ন্যায়, উচ্চাসনে সমাসীন। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে নবীন দ্বিতীয় শিক্ষক, এবং বাম পার্শ্বে বৃদ্ধ প্রধান পণ্ডিত, অবস্থিত। অন্যান্য শিক্ষকগণ তাঁহাদের পশ্চাতে বসিয়াছেন। সম্মুখে বালকমণ্ডলী নীরব, নিস্তব্ধ; স্বয়ং গাম্ভীর্য্য-মূর্ত্তি যেন সভায় সমুদিত।

তখন সর্ব্বজনসমক্ষে অপরাধী আনীত হইল। আদেশ মত, সে, হেড্‌মাষ্টারের অদূরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চেহারা পাতলা ছিপ্‌ছিপে; গৌরবর্ণ; ডবলব্রেষ্ট কামিজ; সোনার বোতাম; এলবার্ট টেড়ি; গোঁফের ঘোরকৃষ্ণ রেখা; আঙটী;—ইত্যাদি তাঁহাতে সমস্তই আছে। ঐ ব্রাঞ্চ স্কুলে থাকিয়াই তিনি উপরি উপরি দুইবার এণ্ট্রেন্স ফেল হন। ইহার পূর্ব্বে, চুঁচুড়া ফ্রীচার্চ হইতে কতবার যে তিনি প্রবেশিকা-সাগর পার হইতে চেষ্টা করেন, তাহার হিসাব পাওয়া দুষ্কর। একটী বালক সে বৎসর নূতন এণ্ট্রেন্স পাস করিয়া, হুগলী কলেজে এলে পড়িতেছিল। সেই বালকটী

বলিল "আমি যখন এ, বি, সি, পড়ি, উনি তখন এণ্ট্রেন্স ক্লাসে উঠেন; উনিই আমাদের তখন মানে বলে দিতেন।"

সে যাহা হউক, অপরাধী কৈলাসচন্দ্র বীরপুরুষের ন্যায় নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া, একদৃষ্টে আপন মনে চাহিয়া রহিলেন। যেন কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই, যেন আজ কিছুই ঘটে নাই, যেন সংসার-সমুদ্রে ঘোর তরঙ্গ-তুফান উঠে নাই।

যেমন অপরাধী নির্ভয়, নিরুদ্বেগ; বিচারকও সেইরূপ অথবা তদপেক্ষা ভয়ঙ্করী নির্ভয়া মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। বীরেশ্বর বাবুর আরক্ত লোচন ধক্‌ধক্‌ধক্‌ জ্বলিতেছে; হস্তস্থিত হাতা-অস্ত্র ঘন ঘন ঘুরিতেছে, দক্ষিণ-পদের জুতা ঘন ঘন ক্ষিতিতল ঘর্ষণ করিতেছে; আর তাঁহার মুখের সেই ভৈরব ভঙ্গীতে জীবকুল বিভীষিকা দেখিতেছে। বীরেশ্বর বাবু ঘোর বাজখাঁই-রবে কৈলাসচন্দ্রকে বলিলেন, "দেখ, কৈলাস, তুমি আজ গুরুতর অপরাধ করিয়াছ—তোমার শাসন আবশ্যক।"

নির্ভয় কৈলাস ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন,—"আমার অপরাধ নাই; আমাকে অনর্থক দণ্ড দিবেন কেন?

তখন বীরেশ্বর বাবু যেন আষাঢ়ের নব মেঘবৎ গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের ন্যায়, তাঁহার হাতা বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরিতে লাগিল। হেডমাষ্টারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিষম দুলিতে লাগিল; চেয়ার নড়িয়া উঠিল। কটুকষায়িত লোচনে রুক্ষস্বরে কৈলাসকে পুনরায় বলিলেন; "দেখ, কৈলেসা, আজ তোর হাড়গোড় চূর্ণ করে ফেল্‌বো—তোর মুখ থেঁতো কর্‌বো—নাক্‌ দিয়ে একসের রক্ত বার্‌ ক'রে ফেল্‌বো।"

কৈলাস এবার যোড়হাতে অথচ নির্ভয়ে, ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনি আমার অপরাধের প্রমাণ লইয়া আমাকে ফাঁসি দিন্‌। দোষ করিলে, অবশ্যই দণ্ড লইব।"

বীরেশ্বর। আজ তিন মাস হইল, আমি স্কুলের সকল শ্রেণীতে লিখিত-নিয়ম প্রচার করিয়াছি যে, উপর তিন ক্লাসের ছাত্রগণ, স্কুল মধ্যে কোনও কারণে (শিক্ষকের অনুমতি ব্যতীত), নিম্ন ছয় ক্লাসের ছাত্রগণের সহিত মিশিতে বা কথা কহিতে, বা বেড়াইতে পারিবে না। অদ্য তুমি বিপিনের সহিত মিশিলে কেন? কথা কহিলে কেন?

কৈলাস। (যোড়হাতে) এ নিয়মের আমি বিন্দু বিসর্গও জানি না। আমি আপনার নিয়ম জ্ঞাত থাকিলে, লঙ্ঘন করিব কেন?

বীরেশ্বর। কিঃ—স্কুলের সকলেই ও-কথা জানিল, আর তুমি তাহা জান না?—পাষণ্ড!—বদ্‌মাইস!—তুই জানিস্, এখনি তোর হাড় এক যায়গায়, মাস এক যায়গায় ক'রে ফেলবো!

কৈলাস। (যোড়হাতে) আপনি রেজেষ্টরি খাতা দেখুন!—যেদিন আপনার সে নিয়ম প্রচার হয়, সেদিন নিশ্চয়ই আমি অনুপস্থিত ছিলাম। যাহা করিতে নাই, তাহা আমি করিব কেন?

বীরেশ্বর বাবুর ইঙ্গিতে দ্বিতীয় শিক্ষক, রেজেষ্টরি বহি আনিয়া দেখিলেন, কৈলাসের কামাই প্রকৃত। যে দিন সে নিয়ম প্রচার হয়, সেদিন কৈলাস অনুপস্থিত। তখন দ্বিতীয় শিক্ষক একটু যেন অপ্রতিভ ভাবে, বীরেশ্বর বাবুর কাণে কাণে বলিলেন, কৈলাস যথার্থই বলিয়াছে,—যে, সেদিন সে উপস্থিত ছিল না।

কথা কাণে কাণে, সংগোপনে বলা হউক, কিন্তু ধূর্ত্ত কৈলাস সমস্তই বুঝিলেন। তখন তিনি যোড়হাতে ক্রন্দনের সুরে, চোখের জল ফেলিবার উপক্রম করিয়া—অথচ সতেজে, বলিতে লাগিলেন, "আপনি সুবিচার করিয়া দেখুন—আমি দোষী হই, আমাকে মারিয়া ফেলুন, তাহাতে আপত্তি করিব না। আপনি রেজেষ্টরি-বুক আনিয়া দেখুন,—আমি সেদিন অনুপস্থিত ছিলাম কি না;—সে দিন যদি আমি উপস্থিত হইয়া থাকি, তবে এখনই, এই মুহূর্ত্তেই আমাকে এই হ'লে ফাঁসি দিন্। আমি কোন অপরাধ কখন করি নাই, কেবল দুষ্টলোকে আমার নামে মিথ্যা বদনাম রটায়।"

(কৈলাসচন্দ্রের, রুমালে মুখ ঢাকিয়া, ক্রন্দন ধ্বনি।)

বীরেশ্বর বাবু মনে মনে ঈষৎ অপ্রস্তুত হইলেন। গম্ভীর ভাবে, নরম সুরে, প্রকাশ্যে বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা, সে কথা যাউক। তুমি আজ বিপিনকে অতি কটু কথা বলিয়া গালি দিয়াছ কিনা বল? তুমি বড়ই গর্হিত আচরণ করিয়াছ। তোমাকে আজ ঘোরতর শাস্তি দিব।"

কৈলাসচন্দ্র তখন মুখের রুমাল খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল

চক্ষুদ্বয় হইতে যেন প্রখর রশ্মি বাহির হইতে লাগিল। তেজে যেন বক্ষস্থল ফুলিয়া উঠিল। ক্রোধে যেন মুখ রক্তবর্ণ হইল। সেই বিরাট সত্তার চারিদিকে কটমট চাহিয়া, ভীষণ ভ্রূ-ভঙ্গীতে সভ্যমণ্ডলীকে যেন ভয়াবনত করিয়া; তিনি বক্তৃতার সুরে বলিতে আরম্ভ করিলেন;— "সকলে বিচার করিয়া দেখুন, আমার কোন দোষ নাই। আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, যে দিন ঐ নিয়ম প্রচারিত হয়; সে দিন আমি স্কুলে উপস্থিত ছিলাম না। এক্ষণে আমার বিনীতভাবে প্রার্থনা যে, হেড্‌মাষ্টার মহাশয় রেজেষ্টারি খাতা খুলিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে প্রচার করুন, প্রকৃতই আমি সেদিন স্কুলে আসি নাই। যদি তিনি এ কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হন; তাহা হইলে বুঝিব, আমার অদৃষ্ট মন্দ;— অন্যায় বিচারে; বিনাদোষে দণ্ডিত হইলাম।"

এই কথা শুনিয়া, রক্তচক্ষু বীরেশ্বর বাবু ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিলেন। হঠাৎ, বিনামেঘে, বজ্রপাতের ন্যায় সেই বিকটধ্বনিতে বালকমণ্ডলী চমকিয়া উঠিল। চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে বীরেশ্বর বাবু সেই হস্তস্থিত হাতাচক্র, টেবিলের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। নাসারন্ধ্রদ্বয় দিয়া ঘন ঘন প্রলয় নিশ্বাস বহিতে লাগিল। ক্রোধে, ক্ষোভে, মোহে দেহ যেন ফুলিয়া উঠিল। হিরণ্যকশিপু বধের জন্য আসরে যেন নরসিংহ অবতার অবতীর্ণ হইলেন।

বীরেশ্বর বাবুর সেই সর্ব্বলোক-ভয়প্রদ, অমানুষ চীৎকারটা কি?— "চুপরও—বদ্‌মাইস্, পাজি, নচ্ছার! ফের যদি কথা কহিবি, তবে এই হাতা ক'রে তোর মাথা ভেঙ্গে ফেলিব—"

এই বলিয়া, তিনি হাতা লইয়া টেবিলে এক ভীষণ আঘাত করিলেন। তদ্দণ্ডেই হাতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে, পুনরায় সেইরূপ বিকটরবে তিনি বলিলেন, "তুই যদি আর একটী টুঁ শব্দ করবি, তোর এখনি জিব্ উপ্‌ড়ে ফেলবো।"

কৈলাসচন্দ্র নীরব, নিথর, নিশ্চল,—অবনত-বদন, যোড়হস্ত।

পার্শ্বস্থিত বৃদ্ধ পণ্ডিত, বীরেশ্বর বাবুর কাণে কাণে কি কথা বলিলেন। এই গুপ্ত কথাবার্ত্তার পর, বীরেশ্বর বাবু একেবারে যেন শান্তমূর্ত্তি হইলেন।

তিনি ঝিম্ আওয়াজে ডাকিলেন "বিপিন, বিপিন এদিকে এস।" অতি মিহি-সুরের অনুকরণ করিলেও, চীৎকারে গলা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, বীরেশ্বর বাবুর আওয়াজ বড়ই মোটা বলিয়া বোধ হইল।

বিপিনচন্দ্র হৃষ্টপুষ্ট বালক; নবীন নধর গঠন; শুক্লপক্ষীয় শশীকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধনশীল; বয়স দশ এগার বৎসরের অধিক নহে।

বিপিনকে কেহ চিনিতে পারিলেন কি? কমলিনীর ছোট ভাই,—সেই বিপিন! গৃহশিক্ষক নগেন্দ্রের কাছে বিপিনের সেই একুষ্ট্রা বুঝাইয়া লইবার কথা মনে আছে কি? বিপিন তখন এণ্ট্রেন্স ক্লাসে পড়ে! এখন সে অতি বালক। হুগলী ব্রাঞ্চস্কুলের থার্ডইয়ার ক্লাসে অর্থাৎ ষষ্ঠশ্রেণীতে পড়িতেছে।

আদেশ মত, বিপিন সম্মুখে আসিলে, বীরেশ্বর বাবু ধীরভাবে বলিলেন, "বিপিন, কৈলাস তোমাকে কি কু-কথা বলিয়াছে, তাহা তুমি বল।" বিপিন বালকমাত্র—বিরাট-সভায় রঙ্গভঙ্গ দেখিয়া, সে থতমত খাইল; মুখ দিয়া তাহার বাঙ্নিষ্পত্তি হইল না। বীরেশ্বর বাবু, বিপিনের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "বিপিন তোমার কোন ভয় নাই; যাহা জান, তাহা স্পষ্ট করিয়া বল।"

বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়ও বিপিনের উদ্দেশে বলিলেন, "তা, কোন দোষ নাই, তুমি বল।"

বিপিনের চোখ্ ছল্ ছল করিতে লাগিল। শরীর যেন ঈষৎ দুলিতে লাগিল। কথা কয় কয়, যেন সে, আর কহিতে পারে না; মুখ ফোটে ফোটে, যেন আর ফুটিতে পারে না।

বীরেশ্বর বাবু ধীর অথচ একটু কড়া স্বরে আবার বলিলেন, "বিপিন, তুমি যা বলিবে, শীঘ্র বল—আর বিলম্ব করিও না।"

তখন কাঁদ-কাঁদ বিপিন আধ আধ কথায়, ভাঙা ভাঙা সুরে, জড়াইয়া জড়াইয়া, আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল "ঐ; উনি; আমাকে আজ বড় বিশ্রী কথা বলেছেন। আমি মালীর ঘরে জল খেতে গেছি,—আর উনি আমার সঙ্গে সঙ্গে যেয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন,—'ওরে বিপিন, তোর বড়-দিদিকে কোন্

ডাকাতে ধল্লে রে!—ঘনশ্যাম ডাকাত ধরেছে নয় রে?' তারপর 'আরে, ছি ছি ছি বলে, উনি হাততালি দিতে লাগ্‌লেন!"

এই কথা বলিয়া বিপিন কাঁদিতে লাগিল।

বীরেশ্বর। তুমি কেঁদোনা, কেঁদোনা,—যা কিছু বলিবার আছে, এই বেলা বলো।

বিপিন কাঁদিতে লাগিল, কিছুই বলিতে পারিল না।

বীরেশ্বর। কৈলাস তোমার গায়ে চিঠি ছুড়ে মেরেছিলো নয়?—সে চিঠি কৈ?

বিপিন। সে চিঠি বাবার কাছে। আমি আজ দুপুর বেলা যখন "জল খেতে" বাসায় গেছলুম, তখন সে চিঠি মাকে দেখাই। মা; বাবাকে কাছারি থেকে ডেকে পাঠালেন। বাবা সে চিঠি নিজে রেখে দিয়েছেন, আমাকে ফিরে দেন নাই।

বিপিন যে ক্লাসে পড়ে, সেই ক্লাসের মাষ্টার রতিকান্ত বাবু বীরেশ্বর বাবুকে বলিলেন, "সে চিঠি বিচারের সময় আবশ্যক হইবে বলিয়া, ডেপুটী বাবুর কাছ থেকে আনান হয়েছে।"

বীরেশ্বর। কৈ সে চিঠি? আমাকে দাও!

রতিকান্ত বাবু সে পত্র, হেড্‌মাষ্টারকে হাতে হাতে অর্পণ করিলেন। বীরেশ্বর বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন, "অদ্যকার বিষয় বড় গুরুতর। কৈলাস অত্যন্ত দুর্বৃত্ত দুরাচার হইয়া উঠিয়াছে। ভদ্রলোকের কুলে কলঙ্ক অর্পণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। উহার উপযুক্ত কঠোর দণ্ড আবশ্যক।—এই বালক বিপিনচন্দ্র অতি সুশীল এবং সুবোধ। শিশু বলিয়া, এবং নিকটে বাসা বলিয়া প্রত্যহ ১ টা বেলার সময় আমি উহাকে বাসায় যাইয়া জল টল খাইয়া আসিবার জন্য অনুমতি দিয়াছি। অদ্য বিপিন বাসায় গিয়া মায়ের নিকট, কৈলাসের অত্যাচারের কথা বলে। স্ত্রীর অনুরোধে ডেপুটী বাবু কিয়ৎক্ষণের জন্য বাসায় আসেন। বাসায়, আসিয়া তিনি পুত্রের কথায় আমাকে এই পত্র লিখিয়াছেন;—

প্রিয়তম বীরেশ্বর,

অতি অল্প দিন মধ্যেই, পরব্রহ্মের কৃপায়, আপনার সহিত আমার

প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। আপনার কর্তৃত্বাধীনে যে, বালকবৃন্দ সন্নীতি-পরায়ণ এবং সচ্চরিত্র হইবে; ইহাও আমার দৃঢ় ধারণা। বিপিন আপনার কাছে সুরুচিপূর্ণ শিক্ষা পাইবে বলিয়াই উহাকে ব্রাহ্মস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছি। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয়, অদ্য তাহার বিপরীত ভাব দেখিতেছি। কৈলাসচন্দ্র নামক কোন প্রথম শ্রেণীর বালক; স্কুল মধ্যে অতি অকথ্য ভাষায় বিপিনকে গালি দিয়াছে, হাততালি দিয়াছে। সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন, আমার বালিকা কন্যা কমলিনী নিতান্ত সরলহৃদয়া, সুরুচি-স্বভাবা এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষা-আরব্ধা। কিন্তু কালের কি কুটিল গতি! সেই কমলিনীর নামেই দুর্বৃত্ত কৈলাস, কলঙ্ককালিমা আরোপ করিতে সাহসী হইয়াছে! কমলিনী এখন দ্বিপ্রহরিক নিদ্রিতা। তিনি যদি এ কথা শুনেন, তাহা হইলে বোধ হয়, অভিমানভরে, বিষপানে, প্রাণত্যাগ করিতে পারেন।

আর এক কথা বলিয়া রাখি। ঘনশ্যাম বাবু সাধুপুরুষ, সুরুচিসম্পন্ন এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ। কমলিনী এবং নবঘনশ্যামকে আমি যদি এক শয্যায় সুখশায়িত দেখি, তাহা হইলেও আমি বিশ্বাস করিতে পারি না, যে, উভয়ের অভিসন্ধি মন্দ। কারণ ঘনশ্যাম শিক্ষিত, কমলিনী শিক্ষিতা।

কুরুচিময় কৈলাস স্কুলের কলঙ্ক। স্কুলের সুরুচিভাব সুরক্ষার জন্য, কৈলাসের দণ্ড একান্ত প্রার্থনীয়।

তোমারই রামচন্দ্র।”

রামচন্দ্র বাবুর পত্রপাঠ শেষ হইলে বীরেশ্বর বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। দর্শক মণ্ডলীও নীরব। কৈলাসও নীরব, নড়ন-চড়ন-বিহীন।

বীরেশ্বর, কৈলাসের দিকে তীব্রভাবে চাহিয়া গম্ভীর-স্বরে আবার বলিতে লাগিলেন,—“কৈলাস! তুমি ভদ্রলোকের ছেলে। তোমার পিতা বুনিয়াদি, সম্রান্ত। এবং তিনি সৎলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই ভদ্রকুলে তুমি এরূপ কুলাঙ্গার হইলে কিরূপে? তুমি ত আর ছেলে-মানুষ নাই! তেইশ চব্বিশ বৎসর বয়স হইল, এখনও এণ্টেন্স পাস করিতে পারিলে না; পাস করা দূরে যাউক, তুমি অত্যন্ত দুরাচার হইয়া উঠিয়াছ। বিপিন অতি শিশু,—তাহার গায়ে ছড়া লিখে চিঠি ছুড়ে মার কেন? তুমি ভারি বদমাইস,

অসভ্য এবং অসচ্চরিত্র হইয়া উঠিয়াছ। এমনি কথাই কি চিঠিতে লিখিতে হয়?—ছি!—এই বয়সে এত ছড়া শিখ্‌লে কোথা?"

"বীরেশ্বর বাবুর সেই ছড়া পাঠ,—

কমলবনে কমলিনী করে কমলখেলা।
নবঘনশ্যাম তথায় মুচ্‌কি হেসে গেলা॥
হেসে হেসে কাছে ঘেঁসে বসে শ্যামরায়।
কমলিনী কমল মারে শ্যামরায়ের গায়॥
কমলমালা লয়ে ধনী বাঁধে শ্যামের হাত।
শ্যাম বলে মরি মরি বিষম আঘাত॥
হেনকালে ধেয়ে এলো ডাকাত দুজন।
শ্যামের মাথা ভেঙ্গে তারা হলো অদর্শন॥
কমলিনী কমলবনে লুকায়ে আবার।
হেলে দুলে হেসে হেসে খেলে চমৎকার॥"

এই ছড়া শুনিয়া, কোন কোন শিক্ষক একটু আধটু মুচ্‌কে হাসিলেন। বৃদ্ধ পণ্ডিতটী একটু অধিক মাত্রায় সে হাসিতে যোগ দিলেন। ক্রমশ সে হাসি, সংক্রামক হইয়া, বালকমণ্ডলীতে প্রবেশ করিল। তখন আর রক্ষা রহিল না। বিতিকিচ্ছি হাসির রবে সভামণ্ডপ পূর্ণ হইল। কোথাও হোহো ধ্বনি, কোথাও হাহা ধ্বনি, কোথাও হিহি ধ্বনি, অন্তিমে সর্ব্বত্র হাততালি ধ্বনি—এই ধ্বনি চতুষ্টয়ে বিচারভূমি গরম হইয়া উঠিল। তখন প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় জলন্ত ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া, বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, হাতা হস্তে বীরেশ্বর, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বজ্রবৎ বিভীষণ রবে বালকগণকে সম্বোধন করিলেন, "চুপ রও,—ফের্ যে গোল করিবে, তার হাতে দশ দশ হাতা হইবে।"

এক চীৎকারে বালকদল নীরব হইল,—পৃথিবী শীতল হইল,—যেন কেহই তথায় নাই বলিয়া বোধ হইল।

আবার বিচার আরম্ভ হইল। এইবার সাক্ষ্য গ্রহণ। প্রথম সাক্ষী মালী। সে বলিল, "হ্যাঁ, আমি কৈলাস বাবুর কথায় বিপিনকে কাঁদিতে দেখিয়াছি এবং ডেপুটী বাবুর দরোয়ানের সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে বিপিন

১ টার সময় ঘরে গিয়াছিল।" দ্বিতীয় সাক্ষী রতিকান্ত বাবু। তিনি বলিলেন, "আমি অন্য কিছুই জানি না, মালীর মুখে সব কথা শুনিয়াছি।" তৃতীয় সাক্ষী, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র হরেকৃষ্ণ সমদ্দার। সে বলিল, "বিপিনের সঙ্গে কৈলাসের মারামারি হয়। শেষে কৈলাস, ঐ ছুরার চিঠি ছুড়িয়া বিপিনকে মারে।"

সাক্ষীর জোবানবন্দী গৃহীত হইলে, বীরেশ্বর বাবু বলিলেন, "দেখ কৈলাস, তোমার অপরাধ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ হইয়াছে। তোমার প্রতি গুরুতর দণ্ডাজ্ঞার সময় উপস্থিত। এ সময় তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে, তবে তাহা বল।—শীঘ্র বল, আর বৃথা কালবিলম্ব করিও না।"

কৈলাসচন্দ্র কোন কথাই কহিলেন না। পূর্ব্ববৎ নীরব, নিস্তব্ধ, অসাড় ভাবেই রহিলেন।

বীরেশ্বর। দেখ কৈলাস, এখনও সময় আছে; কোন কথা বলিবার থাকিলে এ সময় তোমার প্রকাশ করিয়া বলা উচিত

কৈলাস তথাচ নীরব।

বীরেশ্বর। আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না। এখনি দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইবে—সাবধান!

কৈলাস এবারও একটী বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না—কেবল বীরেশ্বর বাবুর দিকে ম্লানভাবে তাকাইয়া, আপন অধরোষ্ঠে এবং কপালে হাত দিলেন। তৎপরে আবার সেইরূপ নীরবে অবনত, বদন হইলেন।

বীরেশ্বর। (ক্রোধে) কৈলাস! এ বুজ্‌রুগীর স্থান নয়। তোমার পক্ষে কোনরূপ সাফাই থাকে, স্পষ্ট কথায় বল। কিন্তু যখন তুমি কোনও উত্তর দিতে পারিতেছ না, তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, তুমি নিশ্চয়ই অপরাধী। আর আমি অপেক্ষা করিব না,—এই শুন,—তোমার দণ্ডাজ্ঞা—

কৈলাস পাহাড়ীতে সকরুণ সুর ধরিলেন;—" সকলে বিচার করিয়া দেখুন,—আমি কথা কহিব কেমন করিয়া? আমার কথা কহিবার অধিকার কৈ? এই একটু পূর্ব্বেই হেড্‌মাষ্টার মহাশয় হুকুম দিলেন যে; আমি কথা কহিলেই তিনি আমার জিহ্বা টানিয়া বাহির করিবেন। আবার তিনিই

এখনিই সেই মুখেই বলিতেছেন, " কৈলাস তুমি কথা কও।" তাই আমি কপালে হাত দিয়া দেখাইয়াছিলাম, " হা অদৃষ্ট!" আর, যুক্ত-অধরপল্লবে হাত দিয়া বুঝাইয়াছিলাম, " আমার অধরোষ্ঠ বিযুক্ত করিবার শক্তি কৈ?' কিন্তু এ কার্য্যে, হেড্‌মাষ্টার মহাশয় আমাকে বুজ্‌রুক্‌ বলিলেন। হা ভগবান্! তুমি কোথায়? আর, আমার নামে যে সকল বৃথা অভিযোগ আসিয়াছে, তাহার বিলক্ষণ সদুত্তর আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কোন লাভ নাই বলিয়া, বলিব না। এক্ষণে নিবেদন, আমি গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে চাহি না,— আমি কথা কহিয়াছি, গুরু আমার জিহ্বা উপাড়িয়া বাহির করুন। এ কাজে আমি রাজি আছি।"

কৈলাসের কথায় কতকগুলি বালকের মুখমণ্ডলে হাসি দেখা দিল। কোন কোন শিক্ষকও, মুখে চাদর দিয়া অতিকষ্টে হাসির বেগ সম্বরণ করিলেন। কিন্তু বিরাট সভার বিক্রমে, ফুটিয়া হাসিতে কাহারও সাহস হইল না।

বীরেশ্বর বাবু চারি দিকে হাসি-রাশির সমাবেশ দেখিয়া বড়ই লজ্জিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল যেন ভয়ঙ্করী হাস-রাক্ষসী, করাল দংষ্টা বাহির করিয়া, লহলহ রসনায় তাঁহাকে গিলিতে আসিতেছে। তিনি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না,—বীরমূর্ত্তিতে বীরেশ্বর বজ্রহস্তে দাঁড়াইয়া উঠিলেন,— বলিলেন, "তবেরে নচ্ছার, কৈলেসা!—এক হাতায় তোর মাথা গুঁড়ো ক'রে ফেল্‌বো জানিস্"—এই কথা উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি তদভিমুখে ধাবিত হইবার উপক্রম করিলেন।

বড় বিষম ব্যাপার। ত্রাহি মধুসূদন! ত্রাহি মধুসূদন! শুদ্ধ বালকদল ভয়-বিস্ময়ে অর্দ্ধ-স্তিমিত নেত্রে এ অপূর্ব্ব কাণ্ড অবলোকন করিতে লাগিল। বীরদাপে দুর্জ্জয় বীরেশ্বর বীরভদ্রবৎ যেন দক্ষযজ্ঞ বিনাশার্থ বালক প্রতি ধাবিত হইলেন।

তখন বৃদ্ধ পণ্ডিত, "ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও" রবে গিয়া, বীরেশ্বরের হাত ধরিলেন। পণ্ডিতটীর বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসরের কম নহে। দেখিতে ঠিক পাকা আমটীর মত। বীরেশ্বর বাবুর পিতা, স্বয়ং বীরেশ্বর বাবু এবং বীরেশ্বর বাবুর পুত্র—এই তিন পুরুষই ঐ পণ্ডিতের ছাত্র। বিশেষতঃ বীরেশ্বর বাবু স্বভাবতই বৃদ্ধকে বড়ই ভক্তি, শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এবং তাঁহার যত্নেই

পণ্ডিতের ব্রাঞ্চস্কুলে এ বৃদ্ধবয়সের চাকরী আজও বজায় আছে। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, বীরেশ্বর কায়স্থ। ব্রাহ্মণ তাঁহার হাত ধরিলেন, গুরু তাঁহাকে নিষেধ করিলেন,—কাজেই বীরেশ্বর অনন্যোপায় হইয়া, চেয়ারে বসিলেন।

কিন্তু কৈলাস ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি সদন্তে বলিতে লাগিলেন, "প্রহারে আমি ভয় করি না। আমি এই বক্ষ পাতিয়া দিলাম, আপনার যত ইচ্ছা হয়, কীল, ঘুঁষি, লাথী মারুন্। বিশেষত, আপনি এখন রাজা স্কুলের অদ্বিতীয় অধিপতি। এখানে আপনার অতুল সহায়-সম্পত্তি; দপ্তরী, দ্বারবান, মালী, শিক্ষক, ছাত্র—সকলেই আপনার অধীনস্থ এবং আজ্ঞাবাহী। আর, আমি এখানে একাকী, নিঃসহায়। সুতরাং এস্থলে আমাকে মারিতে আপনার অধিক আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। দরোয়ানকে হুকুম দিন,—সে আমাকে বাঁধিয়া ফেলুক; আর আপনি আমার পাপাটা হাতাপেটা করুন্।"

বৃদ্ধ পণ্ডিত গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "কৈলাস! তুমি বুঝে-সুঝে কথা কও; পাগলের মত বকিও না। বেশ ধীরস্বভাব হও। হঠাৎ রাগিয়া উঠিও না। তোমার যদি কোন বক্তব্য থাকে, তবে তাহা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা মেজাজে বল।"

কৈলাস। পণ্ডিত মহাশয়! আপনি যদি আমার সমস্ত কথা শুনেন, এবং সুবিচার করেন,—তাহা হইলে আমি বলিতে প্রস্তুত আছি। পণ্ডিত মহাশয়! আপনার পায়ে ধরে বল্‌ছি, আপনি আমার সব কথাগুলি আগে শুনুন।

পণ্ডিত। দূর পাগল! তোর কথা শুন্‌বো বলেইত তোকে নিয়ে এত হাঙ্গাম কচ্চি। তুই বল্‌—তোর কিছু ভয় নাই।

কৈলাস। আমি সমস্তই বলিব,—আধখানা কথা বলা হতে না হতে কেহ যেন বাধা না দেন,—এইটী আপনি দেখবেন।

পণ্ডিত। আঃ—তুই বল্‌না বাপু,—তোর কি বল্‌বার আছে! আমি বল্‌ছি—তোকে কেউ বাধা দিবে না।

কৈলাস। সকলে শুনুন,—আমি যাহা বলিব, তাহাতে এক বর্ণও মিথ্যা নাই। বিপিন অদ্য আমার উপর যে অভিযোগ আনিয়াছে, তাহা সত্য।

তামাসার ছলে, হাসিতে হাসিতে আমি বিপিনের গায়ে ছড়ার কাগজ ছুড়িয়া মারিয়াছি—ইহাও সত্য। কিন্তু ইহাতে আমার দোষ কি? ইহাতে আমার গুরুতর অপরাধই বা কি হইল? চুরী, ডাকাতি, জাল, ফ্রেব—এ সব ধরাইয়া দিতে পারিলে, পুলিসের কাছে পুরস্কার আছে, এবং সমাজেরও মঙ্গল আছে। প্রকৃত সাহসী ব্যক্তি, সংসারের অমঙ্গলকর গুপ্ত মন্দ কাজ প্রকাশ করেন। ডেপুটী বাবুর কন্যা সতী সাবিত্রী হউন, তাহাতে আপত্তি করি না; ঘনশ্যাম বাবু পরমহংস হউন, তাহাতেও আমার কোন কষ্ট নাই। কিন্তু এই যে, স্কুলের আট দশ জন বালক প্রত্যহ ডেপুটী বাবুর বাসায় গিয়া বৈকাল হইতে রাত্রি ৮টা পর্যান্ত কমলিনীর সহিত হাসি তামাসা, গান বাজনা করে—এটা কি বলুন দেখি? হেডমাষ্টার মহাশয়কেও বলি, প্রত্যহ দুই তিন জন বালক যে, বেলা ১টার সময় পলাইয়া ডেপুটী বাবুর বাসায় যায়, তাহার কি কোন খবর তিনি রাখেন? ডেপুটী বাবুর বাড়ীটা কি পীঠস্থান?—যে, সেখানে একবার না গেলে চারি পোওয়া পুণ্যের সঞ্চয় হয় না? অধিক আর কি বলিব, এই স্কুলের একজন শিক্ষকও আজ এক মাস হইল তথায় ঘুণ ঘুণ ক'রে যেতে আরম্ভ করেছেন। আমিই না হয় ডেপুটী বাবু ও তাঁহার কন্যার এখন বিষ-নজরে পড়িয়াছি—সুতরাং আমার গুরুতর দণ্ড একান্ত প্রার্থনীয়। কিন্তু ঐ যে আট দশটী ছেলে, প্রত্যহ কমলিনীর সঙ্গে ইয়ার্কি দেয়, হার্ম্মোণিয়মের সুরে এক সঙ্গে গান করে—উহাদের কি গুরুতর দণ্ড প্রার্থনীয় নহে? আর, ঐ শিক্ষকটীর কি মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দেওয়া উচিত নহে?—বিপিনকে আজ একটা কথা ব'লে আমিই কি কেবল চোরের দায়ে ধরা পড়েছি?—পাপ কথা প্রকাশ করিলে সমাজের মঙ্গল আছে, তাই আমি ওকথা ব্যক্ত করিয়াছি। ইহাতে আমার দোষ কি? স্কুলটা যে উৎসন্ন যেতে বসেছে, তার দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই,—আর, এই যত রোখ, এই গরীব-আমার উপর!—আমি না জানি কি?—আমি কাল রাত্রে ডেপুটী বাবুর বাড়ী ডাকাতিও দেখেছি, ডাকাতও দেখেছি, ঘনশ্যামকেও দেখেছি,—তবে খুলে বল্লেই দোষ! চুপই আচ্ছা! মরেছি, কথা কহিতে নাই!"—

কৈলাসের এই তেজভরা বক্তৃতার বৈদ্যুতিক শক্তিতে, সভাস্থ সমগ্র প্রাণীকে যেন মোহাভিভূত করিল। কৈলাসকে প্রতিনিবৃত্ত করে, এমন ক্ষমতা কাহারও রহিল না। যেন যাদু-মন্ত্রবলে নত-শির সর্পের ন্যায় সকলে অবনত-বদনে রহিলেন। দেখিতে দেখিতে চতুর্থ শিক্ষকটী সরিয়া পড়িলেন। সর্ব্বতোচক্ষু কৈলাস অমনি বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন, পণ্ডিত মহাশয়! চতুর্থ শিক্ষক পলাইয়া গেলেন! বলুন্ দেখি, হঠাৎ কিসের ভয়ে উনি অন্তর্দ্ধান হইলেন?—আর, ঐ দেখুন, ঐ দেখুন,—চারিজন ধেড়ে ছাত্র ঐ পলায়, ঐ পলায়! কেন উহারা লুকাইয়া পলায়, কিছু বুঝিলেন কি?"

প্রকাণ্ড-দেহ বীরেশ্বর দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আবার সেইরূপ ভৈরব-রবে বলিলেন,—"কৈলাস! তোমার আর কিছু কি বলিবার আছে? যাহা থাকে শীঘ্র বল—সময় নাই।

কৈলাস। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন যে, আমি, নির্দ্দোষ!

বীরেশ্বর। আমার নিকট অন্য কোন বিষয়ের বিচার হইবে না। তুমি অদ্য বিপিনকে কুকথা বলিয়াছ কি না, ইহাই আমার বিচার্য্য। তুমি নিজে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছ যে, হাঁ! আমি ঐ কুকথা বলিয়াছি।

কৈলাস। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা ত কু-কথা নহে। বিপিনের মঙ্গলের জন্য, ডেপুটী বাবুর মঙ্গলের জন্য, কমলিনার মঙ্গলের জন্য, এবং স্কুল-বালকগণের মঙ্গলের জন্য আমি ঐ কথা বলিয়াছি। আপনি বিজ্ঞ, সুবিবেচক,—বুঝিয়া দেখুন, যে কথা সর্ব্বলোকের মঙ্গলপ্রদা, তাহা কখনও কু-কথা হয় না। আমি সদুদ্দেশ্যে ভাল কথাই বলিয়াছি। সুতরাং আমি নিরপরাধী। আমাকে দণ্ড দিউন, আপত্তি নাই; কিন্তু নির্দ্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করিবেন না। আপনার গায়ে জোর আছে, আমাকে মারিতে পারেন; আমি দুর্ব্বল, সহিয়া যাইব।

বীরেশ্বর। আর, বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারি না। কৈলাস আপন মুখে নিজ দোষ স্বীকার করিয়াছে। অতএব উহার ২৫ হাতা দণ্ড হইল।—দারোয়ান, কৈলাসকো জল্‌দি পাকড় লাও—

দ্বারবান কৈলাসের নিকট অনেক বক্‌সীস খাইয়াছে। বিশেষ, প্রতি বৎসর পূজার সময়, কৈলাস, ঐ দ্বারবানকে ধুতি চাদর দিয়া থাকেন। ৺পূজা ত নিকট-প্রায়। দ্বারবান আরও জানে, কৈলাসচন্দ্র বড়ই তেজী লোক : পাছে গায়ে হাত দিলে কৈলাস তাহাকে কামড়াইয়া দেয়, ইহাই তাহার ভয় হইল। কিন্তু দ্বারবান কি করে!—ওদিকে অন্নদাতা বীরেশ্বর, এ দিকে বক্‌সীস্‌দাতা কৈলাস। তাই সে, ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে, পেছুপানে চাহিতে চাহিতে, ম্লানমুখে কৈলাসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যাইতে যাইতে তাহার পায়ে পায়ে বাধিতে লাগিল। দেহ কম্পিত হইল।

কৈলাসও সবেগে দ্বারবানাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন কৈলাস স্বয়ং স্বইচ্ছায় বীরেশ্বর বাবুর সমীপস্থ হইবার জন্য চলিয়াছেন। কিন্তু দ্বারবানের কাছে আসিয়াই তিনি তাহার গালে একটী পাকা ৮২ সিক্কা ওজনের চড় মারিলেন। "কোন্‌ শ্যালা আমাকে বিনা অপরাধে গ্রেফ্‌তার করে?"—এই বলিয়া এক মহাহুঙ্কার রব ছাড়িয়া, তিনি দৌড়িলেন। বীরেশ্বর বাবু ধর্‌ ধর্‌ করিয়া দু চারি পা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কিন্তু কৈলাসকে আর পায় কে? কৈলাসচন্দ্র চারি লাফে স্কুলের সম্মুখস্থ ময়দান পার হইয়া, নিমেষ মধ্যে কম্পাউণ্ডের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া, নক্ষত্রবেগে চম্পট দিলেন। বালকগুলা হো হো রবে চারিদিকে ছুটাছুটী করিতে লাগিল। শৃঙ্খলা, নিয়ম, সমস্তই ভঙ্গ হইল। কেহ হাসিতে লাগিল, কেহ নাচিতে লাগিল। কোন বালক থামের আড়ালে গিয়া গান ধরিল,—

কেন আজ কেঁদে গেল বংশীধারী।
বুঝি অভিপ্রায়,
বঁধু ফিরে যায়,
সাধের কালাচাঁদকে কি বলেছে ব্রজকিশোরী॥

বীরেশ্বর বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এক দৃষ্টে ফ্যাল ফ্যাল চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার যেন বুদ্ধি লোপ পাইল। তিনি যেন জীবন্তে মৃতবৎ হইলেন। বৃদ্ধ পণ্ডিত বীরেশ্বরকে বলিলেন, "আর এখানে কেন?—সন্ধ্যা

প্রাণ হয়ে এলো; চলুন, আমরা বাসায় যাই। কৈলাস বড়ই দুর্বৃত্ত হয়ে উঠেছে; উহার পিতাকে বলে, শাসন করিতে হইবে।

বীরেশ্বর বাবু এ কথায় কোন উত্তর দিলেন না। পণ্ডিতের কথামত, কেবল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। আর, চপেটাঘাত জ্বালায় জর্জ্জরিত,—প্রফুল্লিত-গণ্ডস্থল শ্রীল শ্রীযুক্ত সেই দ্বারবান বীরেশ্বর বাবুর বাক্স কাঁধে করিয়া, তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

এদিকে কিন্তু হুগলীর প্রায় সমস্তই সাবালক ছাত্র উত্তম মধ্যম তৈয়ারি হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা একে একে, দুয়ে দুয়ে, দলে দলে, সান্ধ্য-সমীরণ সেবনার্থ রাজপথে বহির্গত হইয়াছে। বীরেশ্বর বাবু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, ত্রিশ হাত দূরস্থিত একদল বালক মিহিস্বরে গান ধরিয়াছে,—

সুখের লাগিয়া, পিরীতি করিনু,
শ্যাম বঁধুয়ার সনে।
পরিণামে এত; দুখ হবে বলে,
কোন্ অভাগিনী জানে॥

সই! পিরীতি বিষম মানি।
এত সুখে এত, দুখ হবে বলে,
স্বপনে নাহিক জানি॥

আর, কিয়দ্দূর গিয়া, বীরেশ্বর বাবু, দ্বিতলের বারেন্দায় তাকাইয়া দেখিলেন, বালকগণ গাহিতেছে,—

বিবিধ কুসুম, যতনে আনিয়া,
গাথিনু পিরীতি মালা।
শীতল নহিল, পরিমল গেল,
জ্বালাতে জ্বলিল গলা॥

সেই মালা কেন হেন হৈল
মালায় করিয়া, বিষ মিশাইয়া,
হিয়ার মাঝারে দিল॥

জ্বালায় জ্বলিয়া, উঠিল যে হিয়া,
আপাদ-মস্তক চুল।
না শুনি, না দেখি, কি করিব সখি,
আগুন হইল ফুল॥

ফুলের উপর চন্দন লাগল,
সংযোগ হৈল ভাল।
দুই এক হৈয়া, পোড়াইল হিয়া,
পাঁজর ধসিয়া গেল॥

গঙ্গার ধার দিয়া যাইতে যাইতে, বীরেশ্বর বাবু শুনিলেন, বড় বাবুর ছাদে বসিয়া একটী বালক তানপুরা সংযোগে গাহিতেছে,—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই,
তোমা বই আর জানিনে॥

বিধুমুখে মধুর হাসি,
দেখ্‌তে বড় ভাল বাসি,
তাই তোমায় দেখিতে আসি,
দেখা দিতে আসিনে॥

বীরেশ্বর বাবু ভাবিতে লাগিলেন, হঠাৎ হুগলী শ্মশান হইল কেন? বালক মণ্ডলী হঠাৎ এইরূপ আদি রসে উন্মাদ হইল কেন? ঐ শুন, কচি কচি ছেলে, যাহারা নেহাত সুবোধ ছিল, তারা পর্য্যন্ত গান ধরিয়াছে,—"শ্যাম, তোমার ভাঙ্গা বাঁশী—"। কেন এমন হইল? এ সোণার সংসারে কেমন করিয়া কৃমিকীট প্রবেশ করিল?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি স্বগৃহে পৌঁছিলেন। বলিলেন, আমার শরীর অসুস্থ, আজ আর আহারাদি করিব না। নির্জ্জনে নিজ কক্ষে শয়ন করিয়া, ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, যেন বালক মণ্ডলী তাঁহার চারিদিক

বেষ্টন করিয়া, পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া, কোমর দুলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া, গান করিতেছে'—

আয় রে !
তোরা কে কে যাবি
জল আনিবারে ;
সেই,—কমলমণির বাঁধা-ঘাটে
প্রেম-সরোবরে।

বীরেশ্বর বাবু শিহরিয়া উঠিয়া বিকট ধ্বনি করিলেন। তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বীভৎসরসে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক হইল। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন, জল দাও। জল পান করিতে করিতে, আবার যেন তিনি শুনিলেন, কোন বালক গাহিতেছে,—

ভাসিয়ে প্রেম তরী
হরি যাচ্চে যমুনায়।
গোপীর কুলে থাকা
হলো দায় !

তখন বীরেশ্বর বাবু যেন সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, কমলমালা গলায় দিয়া, এক একটী ফুটন্ত কমল হাতে করিয়া, এক দল বালক উলঙ্গ হইয়া, তালে তালে, নাচিতে, নাচিতে, গাহিতে গাহিতে, তাঁহার দিকে তীব্রবেগে আসিতেছে,—

পিরীতি বলিয়া, একটী কমল,
রসের সাগর মাঝে।
প্রেম পরিমল, লুবধ ভ্রমর,
ধাওল আপন কাজে॥

বীরেশ্বর বাবু জাগ্রত অবস্থায় সেই স্বপ্ন দেখিয়া, প্রলাপ বকিতে বকিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্কুলে এই হুলস্থূল কাণ্ড ঘটিবার পর দিন হইতেই, পুলিস-সাহেবের এজ-লাসে একটু পরিবর্ত্তন ঘটিল। সাহেব, হঠাৎ ডাকাতির তদারক বন্ধ করিতে বলিলেন। সেই দিন প্রাতে ডেপুটী বাবুর সহিত সাহেবের কি একটা গোপন-পরামর্শ হয়। সেই পরামর্শ অন্তে, ডাকাতির তদারক একেবারে বন্ধ হইল। ইন্সপেক্টর সবইন্সপেক্টর এবং কনষ্টেবলগণ চমকিল। তাহারা ভাবিল, যে ডাকাতির প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান জন্য আজ দুই দিন কাল,—দিন নাই, রাত নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই—আমরা অষ্টপ্রহর পরিশ্রম করি-তেছি, হঠাৎ, বিনা-কারণে, বড় সাহেব সে তদারক বন্ধ করিতে বলেন কেন? অধস্তন কর্ম্মচারীগণ বড়ই গোলক-ধাঁধায় পড়িল।

প্রহারের পরদিন হইতে শ্রীযুক্ত নবঘনশ্যাম নন্দী মহাশয়, রাত্রি-ভ্রমণরূপ শিরঃপীড়ার ঔষধ সেবন বন্দ করিলেন। তবে, রাত্রির পরিবর্ত্তে দিবসেই ঔষধ সেবনের বন্দোবস্ত করিলেন।

ঘনশ্যাম বাবু একজন গুণী ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পাস করিতে পারিলেই একটা মহাসম্মান পাওয়া যাইত। বোধ হয় সে সময় কুড়ি পঁচিশ জনের অধিক বি, এ, উপাধিধারী জন্মগ্রহণ করেন নাই। এখন যেমন হাটে মাঠে গৃহে গোঠে—অলিতে গলিতে, খোঁজে খাঁজে—আটচালায়, পরচালায়, দরমার-বেড়ায়—বি, এ, পাস দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সেরূপ ছিল না;—তখন ছিল, সুরম্য উদ্যানে এক মাত্র মল্লিকার ফুল। পল্লিগ্রামে কোন বি, এ, পাস পৌছিলে, পাঁচ ক্রোশ দূর হইতে লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিত। পাঁচ বাড়ীর মেয়ে একত্র হইয়া, কপাটের অন্তরাল দিয়া, উঁকঝুঁকি মারিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইত। ফলকথা, তিনি, সেকালে, সর্ব্বচক্ষুর লক্ষ্যস্থল ছিলেন। ঘনেশ্যাম প্রথমত অর্থবান্, দ্বিতীয়ত ডেপুটী বাবুর অনুগৃহীত, তৃতীয়ত বি, এ-পাস,—এই ত্র্যহস্পর্শ নিবন্ধন, অল্পদিন মধ্যে, হুগলীতে তাঁহার যে সমধিক পসার বৃদ্ধি হইবে, তৎপক্ষে আর সন্দেহ কি?

এই গুণত্রয়ের উপর তাঁহাতে আর একটা দৈববিদ্যা জন্মিয়াছিল।

তিনি বি, এ-পাসের এক সপ্তাহ পরে হঠাৎ আপনাপনি মহাকবি হইয়া উঠিলেন। ফুটন্ত গোলাপ দেখিলেই তিনি এইরূপ কবিতা রচনা করিতেন,—

রে গোলাপ! ছিলি যবে কুঁড়ি-আধফুটন্ত!
নর-মনে কত আশা উদেছিল হায়!
প্রভাত হইলে এবে, শুকাইবে পাতা!
ঝরিয়া পড়িবে তলে—হবে শেষে মাটী!"

একবার একটী ছাগল দেখিয়া তিনি এইরূপ কবিতা রচনা করেন,—

ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব ছাগল ধরায়।
দুটা কাণ, দুটা চোক, লেজ আছে তায়॥
মুখটী ছুঁচাল তার, কুশ্ কুশ্ করে।
ক্রোধ হলে সিংনেড়ে, ধায় ক্রোধভরে॥
গায়ে লোম মখ্‌মল—কোমল কুসুম।
কবির কল্পনা কাব্য—উপমার ধূম॥
হেলে দুলে ঢুলে ঢুলে চলেরে ছাগল।
দেখে শুনে কত কোটী লেখক পাগল॥

এডুকেশনগেজেটে এই কয়েক ছত্র কবিতা প্রকাশিত হইবার পরই, ঘনশ্যামের নাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত হয়। অনেক বন্ধু, তাঁহাকে আরও ঐরূপ স্বভাবোক্তি-অলঙ্কার-পূর্ণ কতকগুলি কবিতা লিখিতে অনুরোধ করেন। বন্ধুগণের মতে ঐরূপ দ্বাদশটি কবিতা সংগৃহীত হইলে, পঞ্চম ভাগ পদ্যপাঠ তৈয়ারি হইবে। বিশেষতঃ, স্কুল-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ, ঘনশ্যাম বাবুর কবিতা পাঠে বিমোহিত হইয়া বলেন, "এরূপ কবিতা ক্ষণজন্মা। উক্তরূপ কয়েকটী কবিতা, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলেই আমরা এই গ্রন্থ বঙ্গের প্রত্যেক স্কুলে ধরাইয়া দিব।"'

ঘনশ্যাম বাবুর নিকট, বন্ধুগণ ঐরূপ প্রস্তাব করিলে, তিনি হাসিয়া বলিলেন, "যাঁহারা স্বভাব-কবি, তাঁহারা পয়সার জন্য কখন কবিতা লেখেন

না। বিশেষতঃ, আসল খাঁটি কবিতা কখনও অনুরোধে উপরোধে বাহির হয় না। কবিতার ফোয়ারা আপনা আপনি ফুটিয়া উঠে। এই মনে করুন, আমি হয়ত এক বৎসর কবিতা লিখিলাম না—নিশ্চিন্ত আছি,—কমল-বাসিনী কবিতা-দেবীর কোমল কৃপাকটাক্ষ কোন মতেই আমার উপর পতিত হইল না! কিন্তু হঠাৎ একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে কবিতার উৎস উথলিয়া উঠিল—আর বিরাম নাই—বেলা তিনটা না বাজিতে বাজিতেই, এক প্রকাণ্ড মহাকাব্য রচিত হইয়া গেল! কবিতার ঐশী শক্তি বড়ই চমৎকার।"

বন্ধুগণ, বি, এ-পাস ঘনশ্যামের এই অভাবনীয় কথা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্য-অভিভূত হইলেন। তাঁহারা মনে মনে বলিলেন, "আমরাত বি, এ-পাস নই, কবিতা-মাহাত্ম্য কি বুঝিব?"

এই কবিতাময় জীবন নবঘনশ্যামই ডেপুটীবাবুর অনুমতিক্রমে কমলিনীকে প্রথমে কবিতা লিখন প্রণালী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু রাত্রে, ডেপুটীগৃহে, ডাকাত-হস্তে প্রহার, এবং তৎপরে একদিন দিবাভাগে কতিপয় বালক কর্ত্তৃক অঙ্গে ধূলা-বর্ষণ—এই উভয় কারণে তিনি সে যাত্রা হুগলী হইতে ত্বরায় স্বদেশ প্রস্থান করিলেন।

ঘনশ্যামের বাটীতে পৈতৃক দুর্গোৎসব হয়। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি বাটীতে পিতাকে পত্র লেখেন, "এবার পূজার সময় আমি বাটী যাইব না। ওকালতী পরীক্ষা দিতে হইবে। হুগলিতে না থাকিলে পড়া শুনার সুবিধা হইবে না।' কিন্তু সহসা, সাত দিন পরে বাটী গিয়া পিতাকে বলিলেন, "শরৎকালে সহর অপেক্ষা পল্লিগ্রাম, অধিক স্বাস্থ্যকর—ইহা বিজ্ঞানসম্মত। কাজেই শরীর-ধারণের জন্য, বাটীতে আসিতে বাধ্য হইলাম।"

এদিকে, পিতার জবানী, রাধাশ্যামের পত্র, রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। সে পত্রে রাধাশ্যামের পিতা লিখিয়াছেন, "আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। আর অধিক দিন বাঁচিব না। বৌমাকে দেখিতে আমার বড় সাধ হয়েছে। আপনি এসময় ত্বরায় বধূমাতাকে পাঠাইয়া দিবেন।"

এই পত্রের কথা, গৃহ মধ্যে প্রকাশ হইবার এক ঘণ্টা পরে, কমলিনী বলিলেন, "আমি আজ আর, আহার করিব না। আমার

চক্ষু জ্বালা করিতেছে, জ্বর বোধ হইয়াছে।” এই কথা বলিয়া ডেপুটী-কুল উজ্জ্বলকারিণী কমলিনী, মাথায় একটা রুমাল বাঁধিয়া, চারুঅঙ্গে লংক্লথের চাদর জড়াইয়া, খাটে গিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন।

কন্যাকে শ্বশুর-গৃহে পাঠাইবার, ডেপুটী বাবুর বিশেষ কিছুই অনিচ্ছা ছিল না। তবে এ সম্বন্ধে তখন কয়েকটী বাধাজনক আপত্তি মনোমধ্যে উদিত হইল। ১ম, কন্যা অতি বালিকা; এত অল্পবয়সে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পাশ্চাত্য-নীতি-বিরুদ্ধ। ২য়, কমলিনীর এখনও শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। সাহিত্য, সঙ্গীত এবং স্ত্রী-স্বত্ত্ব বুঝিতে তিনি এখনও তাদৃশ পারদর্শিনী হয়েন নাই। সুতরাং এমন অবস্থায় কন্যাকে সহসা শ্বশুরালয়ে পাঠান যুক্তিযুক্ত নহে।

সে যাহা হউক, কমলিনী ত জ্বররোগগ্রস্তা হইলেন। রামচন্দ্র, বেহাইকে এই ভাবে সেই পত্রের উত্তর লিখিলেন;—“আমার মেয়েটী এখনও অতি শিশু। সে সংসারের ভাল মন্দ এখনও কিছুই বুঝে না। তার অন্তঃকরণটী বড়ই সরল। আপনার ব্যারামের সময় কমলিনী মাতাকে তথায় পাঠাইবার কিছুই আপত্তি ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কন্যার জ্বর হইয়াছে। একটু আরোগ্য হইলেই পাঠাইবার চেষ্টা করিব। শ্রীমান রাধাশ্যামকে আমার ভালবাসা দিবেন।”

এই সময় ডেপুটীবাবু বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। রাত্রে তাঁহার বাড়ীতে প্রত্যহই ঢিল পড়িতে লাগিল। তিনি ফটকে দুইজন দ্বারবান্ রাখিলেন, তথাচ ঢিল-পড়া বাড়িল বৈ কমিল না। শেষে শান্তিরক্ষার জন্য দুই জন পুলিস-কনেষ্টবল মোতাইন করিলেন; তথাচ ঢিল যথানিয়মে পড়িতে লাগিল। কিরূপে, কোন্ দিক্ দিয়া, ঢিল পতিত হয়, তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিল না। শুধু কি ঢিল? ঢিলের সঙ্গে কোন কোন দিন ফুলের তোড়াও পড়িতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যার পর দ্বিতলের ছাদে ডেপুটীবাবু এবং কমলিনী উভয়ে একই সোফায় উপবেশন করিয়া, রহসি ঈশ্বর-প্রেমালাপ করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ একটী ফুটন্ত গোলাপ কমলিনীর কোলে আসিয়া পড়িল; আর একগাছি বেলফুলের গ'ড়ে মালা, কে যেন তাঁহার গলায় পরাই

দিল। এই ব্যাপার সংঘটন হইবামাত্র; কমলিনী একটী মৃদুমধুর মিঠেকড়া-গোছ ধ্বনি করিয়া, সোফায় ঢলিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

কেহ বলিল, ভূতের উপদ্রব। কেহ বলিল, বাগানের বেলগাছে একটা শাঁকচিন্নি থাকে—এসব তাহারই কাজ। কিন্তু রামচন্দ্র বাবু ব্রাহ্ম; সুতরাং তিনি চক্ষুর অগোচরীভূত অন্ত ভূত এবং শাঁকচিন্নি প্রভৃতি মানেন না। তিনি বলিলেন, নিরাকার ভূত আবার কি?

ডেপুটীবাবু অন্ত ভূত মানুন, আর নাই মানুন, উপদ্রব সমভাবেই চলিতে লাগিল। একদিন বৈকালে দেখা গেল, কমলিনীর পালঙ্কোপরি দুগ্ধফেণনিভ সুখ-শয্যায়, কে মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়া, কমলিনী আবার মূর্চ্ছিতা হইলেন। কমলিনীর মূর্চ্ছা-রোগের এখন হইতে সূত্রপাত হইল।

অনেকে এখন ডেপুটী বাবুকে পরামর্শ দিলেন, গঙ্গার ধারের এ বাসা পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু পাছে তাঁহাকে কেহ ভূতভয়প্রাপ্ত কুসংস্কারাপন্ন বলে, এই ভয়ে তিনি সহসা সেই বাসা ছাড়িতে পারিলেন না। বিশেষ, কলিকাতার গুরুজী যদি এ কথা শুনেন যে, ভূতের ভয়ে রামচন্দ্র পলাইয়াছে, তাহা হইলে, তিনিত তৎক্ষণাৎ দল হইতে রামচন্দ্রের নাম কাটিয়া দিবেন!

প্রকৃতই রামচন্দ্র বড়ই বিপদে পড়িলেন। বাসায়ও তিষ্ঠিতে পারেন না,—এবং বাসা ছাড়িতেও পারেন না—

না যাইলে রাজা বধে যাইলে ভুজঙ্গ।
রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ!

কেবল বাসায় নহে; স্বয়ং রামচন্দ্র এক দিন রাজপথে বিভীষিকা দেখিলেন। সে সময় হুগলীতে ঘোড়গাড়ীর তত প্রাদুর্ভাব ছিল না। ডেপুটী বাবু প্রত্যহ পাল্‌কী করিয়া কাছারি যাতায়াত করিতেন। একদিন বৈকালে পাল্‌কী করিয়া রামচন্দ্র বাসায় আসিতেছেন, কে যেন, কোথা হইতে আসিয়া একছড়া কমল-মালা তাঁহার বক্ষে ধীরে ধীরে বসাইয়া দিয়া গেল। রামচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া ফ্যাল ফ্যাল নেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

তখন তিনি ঠিক করিলেন, হুগলী ত্যাগ করাই মঙ্গলকর। আপাততঃ সুবিধাও হইল। পূজার ছুটী নিকট। রামচন্দ্র পূজাবকাশে, সপরিবারে স্বগৃহে যাত্রা করিলেন। কমলিনীর মূর্চ্ছাব্যাধি ক্রমশ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হওয়ায়, সঙ্গে একজন মেডিকেল-কালেজ উত্তীর্ণ নবীন চিকিৎসকও চলিলেন।

ওদিকে, অতি অল্পদিন মধ্যেই রাধাশ্যামের পিতার মৃত্যু হইল। বিজয়াদশমীর দিন এ ঘটনা ঘটে। ডেপুটী বাবু তখন স্বগৃহে ছুটী ভোগ করিতেছেন, এবং মনে মনে কল্পনা আঁটিতেছেন, ত্বরায় কলিকাতা গিয়া সেই মুরুব্বি-সাহেবকে ধরিয়া কৃষ্ণনগরে বদলীর প্রার্থনা করিবেন। এমন সময় রাধাশ্যামের পিতৃবিয়োগ-লিপি শোকপত্র আসিয়া পৌঁছিল। এ দুঃসংবাদ পাইয়া অন্নপূর্ণা কাঁদিলেন, কমলিনীও নয়ন-জলে বুক ভাসাইলেন। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "মা কমল। ঘাটে উঠার দুই দিন থাকিতে তোমাকে শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইবে। না গেলে এ পাড়াগাঁয়ে লোক-নিন্দা আছে।"

কমলিনী। মা, তোমার আজ্ঞা আমি কখন লঙ্ঘন করি না; আমাকে যা করিতে বলিবেন, তাহাই আমি করিব। আমার শরীরে যাহা সহিবে তৎক্ষণাৎ আমি তাহা করিব। ডাক্তার বাবু যদি আমার দেহ পরীক্ষা করিয়া মত দেন যে, আমি শ্বশুরগৃহে গেলে শারীরিক কোন ক্ষতি নাই, তাহা হইলে আমি তখনই যাইব। মা, আমার শরীর বড় কাহিল না হলে কি আর এ কথা বলি?—আমি দাঁড়াইলে কেমন ধোঁয়া দেখি, মাথা যেন ঘুরিয়া পড়ে!

অন্নপূর্ণা। মা, তোমার শ্বশুর গঙ্গালাভ করেছেন। ঘাট করিতে নাই। আর তুমি এ সময় না গেলে জামাই বড়ই রাগ করিবেন। যেমন করিয়াই হউক, তোমার এ সময় যাওয়া উচিত। সংসারে যা কর, তাই চলে। পাড়া-গাঁয়ে হিন্দুর আচরণ না দেখলে, লোকে বড়ই নিন্দা করবে। পাঁচবাড়ীর মেয়ে পাঁচ কথা কবে—সে সব আমি সহ্য করিতে পারিব না।

কমলিনী। আচ্ছা, মা! আমি লোকের মনে কষ্ট দিতে চাই না। পরমব্রহ্ম যা করিবেন, তাহাই হইবে। মা, তোমার কথা আমি কবে না শুনিয়াছি?

জননীর আদেশমত, প্রথম দিন হবিষ্যান্ন খাইয়া, কমলিনী যেমন দাঁড়াইয়া উঠিবেন, অমনি তিনি পিতা, মাতা এবং ডাক্তার বাবুর সমক্ষে দড়াম্ করিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। সকলে আ-হা-হা করিয়া তুলিয়া কমলিনীর মুখে জল দিলেন। ডাক্তার বাবু বলিলেন "আতপ-তণ্ডুলের তীব্রবিষে কমলিনীর দেহ [illegible]রিত করিয়া ফেলিয়াছে। একজন জর্ম্মান পণ্ডিত বলিয়াছেন, [illegible] আতপ চাল রমণীকুলের মস্তকীয় ধমনীতে লব্ধপ্রবিষ্ট হইয়া [illegible] মস্ত অঙ্গারবৎ করিয়া ফেলে। মাথা ঘুরিয়া রোগী পড়িয়া যায়। [illegible] পক্ষাঘাত রোগের বিশেষ সম্ভাবনা। আবার বোধ হইতেছে, [illegible] বুঝি বা এই সূত্রে দারুণ পক্ষাঘাত রোগবিশিষ্টা হইয়া পড়েন। [illegible] চিকিৎসক। তাই এত কথা বলিলাম। আপনাদের এক্ষণে যাহা [illegible] করিবেন। এক্ষণে আর একটা কথা না বলিয়া থাকিতে [illegible] না। ধর্ম্ম আগে, না শরীর আগে? শরীর টিকিয়া থাকিলে [illegible] ধর্ম্ম হইবে।"

[illegible] বাহুল্য, ডাক্তার বাবুর এই বক্তৃতার পর, কমলিনীর হবিষ্যান্ন-[illegible] নিষেধ হইল। ডেপুটীবাবু একদিন গোপনে বলিলেন, "দেখুন [illegible] বাবু, কমলিনীর হবিষ্যান্নের কথা কোনরূপে গুরুজীর কাছে যেন [illegible] না পায়। আপনি কথাটা খুব গোপনে রাখিবেন।"

যাহা হউক, পতনের পরদিন হইতে কমলিনীর ব্যাধি বৃদ্ধি হইতে [illegible] ক্রমশ তিনি শয্যাগত হইলেন। ডাক্তার বাবু একমনে এক [illegible] কমলিনীর চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। তিনি বলিলেন "রোগ কঠিন হইবার লক্ষণ দেখিতেছি। কমলিনীকে কলিকাতায় লইয়া [illegible], অন্যান্য ডাক্তারদের সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ আবশ্যক।"

[illegible]শ্যামের কাছে পত্র গেল—"আমার কন্যা শয্যাগতা। কঠিন পীড়ায় [illegible]। উত্থানশক্তি রহিতা। তাঁহাকে পাঠাইবার কিছুই অনুমত ছিল না। কিন্তু কি করি, উপায় নাই। সকলি আমার মন্দভাগ্য বলিতে হইবে।"

[illegible]শ্যাম যে লোক পাঠাইয়াছিলেন, সে ব্যক্তিও তাঁহাকে গিয়া বলিল "আপনার স্ত্রীর ব্যারাম বড় সঙ্কট। ডেপুটী বাবু কলিকাতা হইতে সাহেব ডাক্তার আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন।"

রাধাশ্যাম বোধ হয় বড়ই কাতর হইলেন। একদিকে পিতৃবিয়োগ, [illegible] দিকে স্ত্রীর জীবন সঙ্কটাপন্ন। কিন্তু তিনি অক্ষুব্ধচিত্তে, যথানিয়মে [illegible]সাধ্য আপন কর্ত্তব্য-কর্ম্ম পালন করিলেন। শুনা যায়, এ শ্রাদ্ধব্যাপারে, [illegible] রাধাশ্যামকে প্রায় দুইশত টাকার সামগ্রী পাঠাইয়াছিলেন। [illegible]র্ণার অনুরোধে এই দান-কার্য্য সম্পন্ন হয়। বোধ হয় জামাতা[illegible] মতে সান্ত্বনা করাই অন্নপূর্ণার উদ্দেশ্য ছিল।

শ্রাদ্ধ-অন্তে কমলিনীকে চিকিৎসার্থ কলিকাতা আনা হইল। তথা[illegible] মাস কাল চিকিৎসিত হইলে, ডাক্তার বাবু বলিলেন, "উত্তর-পশ্চিমে[illegible]-বায়ু দুই মাস কাল সেবন না করিলে কমলিনীর এ রোগ সম্পূর্ণরূপে [illegible]রোগ্য হইবে না।"

অগ্রহায়ণ মাসে হাওয়া খাইতে কমলিনী বাহির হইলেন। সঙ্গে বিপি[illegible]র বাবু এবং কপিল খানসামা চলিল। রামচন্দ্রের বৃদ্ধা পিশিমা [illegible]রূপে তাহাদের অনুসরণ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইবার ক[illegible]র হইল।

[illegible] নাম [illegible]হেমেন্দ্রনাথ [illegible] তাদের পূর্ব্বপরিচি[illegible] [illegible]জীর খাস [illegible]সামা। কপিলে[illegible] [illegible]বগতপ্রাণ [illegible] হাতে পড়ে[illegible] [illegible]ময় হইতে কপিল গুরুজীর নিকট শিক্ষা দীক্ষা পাইতেছিল; সর্ব্বা[illegible] [illegible]কাছে বাসায় থাকিত,—কপিল কলিকাতা ছাড়িয়া এ পর্য্যন্ত আর [illegible] যায় নাই। রামচন্দ্র অতীব স্নেহের পাত্র বলিয়া; অবশেষে গুরু[illegible] [illegible]বেএই খানসামা-রত্ন প্রদান করেন। সহবৎগুণে কপিল এখন সর্ব্ব[illegible] [illegible]মান পারদর্শী। ঝোলে, ঝালে, অম্বলে পোড়ায়, ভাতে বেগুণে [illegible] সর্ব্বত্রই সবভাবেই অবস্থিত।

[illegible] কথা ফুরাইল। এইবার প্রকৃত প্রস্তাবে প্রস্থারম্ভ। পাঠক [illegible] মন ব্যক্তি চিনিলেন ত। এখন আর কোন ভাবনা নাই, পরমানন্দে [illegible] ভাগ [illegible]ত আরম্ভ করুন্।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।